ঝাঁপি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়।
৬/১ এ. ধীরেন ধর সরণী। কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৯

প্রকাশক
ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

"রা-স্বা"

বন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

পরমশ্রদ্ধেয়া ব্রহ্মচারিণী বেলা দেবীর (আদ্যাপীঠ)
পবিত্র হস্তে

ঝাঁপি

ফোনটা ধরেছিল বিদ্যা।

হ্যাঁ বলুন।

আমি একটু জ্ঞানাঞ্জনের সঙ্গে কথা বলতে চাই। উনি কি আছেন?

হ্যাঁ, উনি টয়লেটে। একটু হোল্ড করবেন? নাকি কোনও মেসেজ দেবেন?

হোল্ড করছি। দেরি হলে না হয় পরে ফোন করব।

ধরুন, দেখছি।

ফোনের মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে বিদ্যা একটু উঁচু গলায় বলে, দাদা, তোমার ফোন!

বাথরুমে শাওয়ারের শব্দ হচ্ছে। জ্ঞান শুনতে পাচ্ছে না।

ফোনটা রেখে বিদ্যা গিয়ে বাথরুমের দরজায় আঙুলের গাঁট দিয়ে জরুরি শব্দ করল।

ভিতর থেকে জ্ঞান শাওয়ারের শব্দ ছাপিয়ে বলল, কে?

তোমার ফোন।

কে ফোন করছে?

একটা মেয়ে।

একটু দেরি হবে। কে নামটা জেনে নিস।

ঠিক আছে।

বিদ্যা ফোনের কাছে এগিয়ে যেতে গিয়ে দেখল, মা ইতিমধ্যেই ফোনটা তুলে নিয়ে কথা বলছে। টি ভি-র শব্দ কমানো। তার মা ফোনে কথা বলার সময় টি ভি-র শব্দ অবশ্যম্ভাবী কমিয়ে দেবেই। দুটো শব্দ একসঙ্গে হলে তাদের মা একটা শব্দে মনোযোগ দিতে পারে না। বিদ্যা আর দয়া পারে, খানিকটা তাদের বাবা আর দাদাও পারে। মা পারে না। প্র্যাক্টিসের অভাব।

আপনি কে বলছেন?

আমার নাম বন্যা।

ওকে কিছু বলতে হবে?

আমার নাম বললেই হবে। আমি আধ ঘণ্টা পরে আবার ফোন করব।

ঠিক আছে। আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন?

সন্তোষপুর।

আপনার ফোন নম্বরটা বরং দিন। লিখে রাখি। ও বেরোলে—

আমার ফোন ডাউন। আমি একটা বুথ থেকে ফোন করছি।

ও, আচ্ছা।

ফোনটা রাখতেই বিদ্যা ভ্রূ কুঁচকে বলল, মাঝখানে হঠাৎ এসে তোমার ফোনটা ধরার কি কোনও দরকার ছিল?

নবলা বিরক্ত হয়ে বলল, ছিল বই কী! তোরা বড্ড ওপর ওপর কথা বলিস। নামধাম জিজ্ঞেস করে রাখতে হয় না!

আমি ঠিকই জিজ্ঞেস করতাম।

ছাই করিস তোরা। এই তো পরশু আমার এক মামাতো বোন ফোন করেছিল, কে ফোন করেছিল কিচ্ছু বলতে পারল না দয়া।

দয়া বাঁ হাতে একটা ডাঁশা পেয়ারা খেতে খেতে ডান হাতে ধরা রিমোটে টি ভি-র আওয়াজ তুঙ্গে তুলে দিতে দিতে বলল, সেই সময়টায় আমার মেজাজ ঠিক ছিল না। সেদিন বিকেলে আমি কলেজ থেকে ফেরার পথে একগাদা টাকা হারিয়ে ফেলেছিলাম, উইথ আংটি। তোমাকে বলেওছি সেই কথা।

বিদ্যা ঠান্ডা গলায় বলল, তুমি কেন ফোনটা ধরেছিলে আমি জানি।

নবলা রাগের গলায় বলে, কেন?

মেয়েটা কে জানার জন্য। অপার তোমার কৌতূহল। যেই শুনেছ একটা মেয়ে ফোন করেছে অমনি ছুটে এসেছ জানার জন্য।

বেশ করেছি। খোঁজ নেওয়াটা কি অন্যায়?

তা নয়। তবে যেভাবে ফোন নম্বরটম্বর জিজ্ঞেস করছিলে তাতে একটু অভদ্রতা ছিল। ওভাবে কেউ জিজ্ঞেস করে নাকি? কোথায় থাকেন, ফোন নম্বর কত! তোমার ভয়ে আমার ছেলেবন্ধুরা তো ফোন করা ছেড়েই দিয়েছে। রাজীব তো একদিন বলেই ফেলল, ইয়োর মম আস্‌কস টু মেনি কোশ্চেনস।

দয়া বলল, একজ্যাক্টলি। এর চেয়ে মোবাইল ফোন অনেক ভাল। প্রাইভেসি থাকে।

নবলা বেকুবের মতো একটু চেয়ে থাকে। এদুটো মেয়েকে সে বেশ ভয় পায় আজকাল। দুজনেই একসঙ্গে রুখে ওঠে এবং তার পুরনো অভ্যাসের ভুলগুলো খুব নিষ্ঠুরের মতো ধরিয়ে দেয়। দুজনেই অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, অতিশয় ভাল ছাত্রী এবং দারুণ স্মার্ট। এদের সঙ্গে নবলা

কিছুতেই এঁটে ওঠে না।

জ্ঞান দামি অডিকোলোন সাবানের ভুরভুরে গন্ধ ছড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। সে ফরসা, লম্বা, সুপুরুষ। দোষের মধ্যে তার মুখশ্রী একটু ঢলঢলে। অনেকে বলে, ঠিক যেন পুরুষোচিত নয়। বড্ড বেশি টানা চোখ, বড্ডই টিকোলো নাক, ভারী গাল এবং কোঁকড়া চুল।

কে ফোন করেছিল রে বিদ্যা?

নবলা বলে উঠল, বন্যা। সন্তোষপুর থেকে।

একটু যেন থমকাল জ্ঞান। তারপর বলল, ও। কিছু বলল?

আধ ঘণ্টা বাদে ফোন করবে।

ঠিক আছে। বলে নিজের ঘরে চলে গেল জ্ঞান।

এ বাড়িতে তার নিজস্ব একখানা ঘর আছে। বেশ সাজানো ঘর। তার তেমন শখশৌখিনতা নেই। ঝোঁক কেবল বইয়ের দিকে। এ ঘরে বই আছে প্রচুর। চারটে র‍্যাক বোঝাই। একধারে জানালার পাশে লেখাপড়ার টেবিল।

চুপ করে চেয়ারে বসে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল সে। জানালার অদূরে একটা দোতলা বাড়ি উঠছে। হাঁ করা অন্ধকার জানালা দরজা। বাঁশের ভারা এখনও বাঁধা।

বন্যা ফোন করেছিল! কেন? বন্যার সঙ্গে গত পাঁচ বছর সম্পর্ক নেই। হঠাৎ কী দরকার পড়ল তাকে বন্যার? বিশেষ করে ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর!

বন্যা বলতেই তার চোখে ভেসে ওঠে ফরসা মুখে একজোড়া ফ্যাকাশে বা সাদা ঠোঁট। রুগ্ণতা বা রক্তশূন্যতা নয়। ওটাই ওর ঠোঁটের স্বাভাবিক রং এবং বন্যা জীবনে লিপস্টিক মাখত না, কারণ তাকে কেউ বলেছিল, সাদা ঠোঁট ভীষণ সেক্সি, অ্যাট্রাক্টিভ। সৌন্দর্যের ধ্যানধারণা সংজ্ঞা কত পালটে গেছে! আশ্চর্য এই যে, জ্ঞান সেই সাদা ঠোঁটের প্রেমে পড়ে গিয়ে আর আজ পর্যন্ত উঠতেই পারল না।

জানালা দিয়ে একটা সিরসিরে বাতাস এল, বোধহয়। ভেজা গায়ে শীত শীত করছিল। সে উঠে ওয়ার্ডরোব খুলে একটা স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে দিল।

তার কতগুলো থিয়োরি আছে। যেমন সে আজকাল মেয়ে-পুরুষের প্রেমে বিশ্বাস করে না। কাঁচা থিয়োরি নয়, বিবাহিত বন্ধুবান্ধবদের অবস্থা দেখেই সে বুঝতে পারে প্রেম জিনিসটা এখনও সেই নাবালক-ঘেঁষা ভাবপ্রবণতার বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছু নয়। কত সহজে তুচ্ছ কারণেই যে

প্রেম টসকে যায়!

মার মুখে বন্যা নামটা শুনেই তার ভিতরে হঠাৎ একটা খিমচোনোর মতো অনুভূতি যে কেন হল!

ঠিক আধ ঘণ্টা বাদেই ফোনটা এল।

বিদ্যা ডাকল, দাদা, ফোন!

মোটামুটি ধীর পায়েই নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল জ্ঞান। হঠাৎ তার কেন যেন মনে হচ্ছিল, তিন জোড়া কৌতূহলী চোখ তাকে লক্ষ করছে!

নবলা বলে উঠল, আঃ, তোরা টি ভি-র সাউন্ডটা একটু কমা না!

বিদ্যা বলে, দাদার তো কোনও অসুবিধে হয় না মা।

খুব হয়। কমাও বলছি।

বিদ্যা একটু হাসল, শুনবে তো! দিচ্ছি বাবা কমিয়ে।

ফোনটা তুলে জ্ঞান বলল, জ্ঞান বলছি।

সেই মৃদু সংগীতের মতো গলা, আমি বন্যা। চিনতে পারছ?

হ্যাঁ। কেন পারব না? কী খবর?

খবর ভাল নয়। তোমার সঙ্গে আমার ভীষণ দরকার।

কী দরকার বলো!

ফোনে তো সব কথা হতে পারে না। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার।

ও। কিন্তু—

আমাদের বাসা সন্তোষপুরে।

হ্যাঁ। শুনেছিলাম যেন কার কাছে।

একবার আসতে পারবে?

যেতে বলছ?

হ্যাঁ।

কবে?

যদি বলি আজই?

এখন রাত সাড়ে আটটা। এখন কি সম্ভব?

এমনি বললাম। আজ নয়, কাল আসতে পারবে? সকালের দিকে? আমি বাড়িতেই থাকব।

তোমার ঠিকানাটা তো জানি না।

বলছি। লিখে নাও।

ধরো। কাগজ-কলম নিয়ে আসছি।

নিয়ে আসতে হল না। নবলা টক করে একটা ছোট প্যাড আর ডটপেন এগিয়ে দিয়ে বলল, এই তো, লেখ না।

ঠিকানাটা লিখে নিল জ্ঞান।

আমি কি নিশ্চিন্ত হতে পারি জ্ঞানাঞ্জন?

হ্যাঁ।

ক'টায় আসবে?

দশটাটশটা হবে হয়তো। কলকাতায় এলে আমি একটু বেলা অবধি ঘুমোই।

এখনও সেই ঝাড়গ্রামেই পড়ে আছ?

ঝাড়গ্রাম নয়, সেখান থেকেও খানিকটা দূরে।

সেটা কি সরকারি কলেজ?

না। বেসরকারি।

অনেকদিন কোনও খোঁজখবর নেই।

হ্যাঁ, অনেকদিন। তোমার রিসার্চ শেষ হল?

কই আর হল! হয়তো আর হবেও না। চাকরি খুঁজছি।

রিসার্চটা শেষ করে নিলে পারতে।

সেসব কথা মুখোমুখি বলব। কাল আসছ কিন্তু।

হ্যাঁ। যাব।

ছাড়লাম।

সাদা দুটি ঠোঁট সারাক্ষণ চোখে দেখতে পাচ্ছিল জ্ঞান। দুটো সাদা ও সুস্বাদু ঠোঁট। তার জীবনে প্রথম চুম্বন এই ঠোঁটে! কী আশ্চর্য শিহরন আর ডুবে-যাওয়া ছিল পাণ্ডুর বর্ণের দুটি ঠোঁটে!

তার বাবা আসানসোলের এক কোলিয়ারিতে সেফটি ম্যানেজার। কলকাতার লেক টাউনে একটি ছোট বাসা ভাড়া নিয়ে তারা চারজন ছাত্র মেস করে থাকে। তখন পিয়োর ম্যাথেম্যাটিকসে এম এস-সি পড়ছে জ্ঞান। নিজের বিষয়টি সে ভালই বুঝত। অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস ছিল, এম এস-সিতে অন্যরকম হওয়ার কথা নয়।

মেসবাড়ির বাড়িওয়ালা নবীনবাবু দোতলায় একা থাকতেন। ছেলে বিদেশে, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, স্ত্রী গত হয়েছেন। সুতরাং তাঁর সময় কাটত না। সকালবেলায় তিনি পাড়ায় বেরিয়ে বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর নিতেন, বসে দু-চার দণ্ড কথাও বলতেন। বুড়ো বয়সে লোককে কথাতে পায়। কিন্তু নবীনবাবু তেমন বকাবাজ লোক ছিলেন না। মাত্রাজ্ঞান ছিল খুব টনটনে। তাদের চারটি প্রাণীরও খোঁজখবর নিতে

দেহগত সম্পর্ক হয়ে গেলে পাগল পাগল ভাবটা আর থাকে না। চোখে-হারাই চোখে-হারাই রকমটা একটু কমে যায়। মতি কিছুটা স্থির হয়েছে। ঠান্ডা মাথায় জ্ঞান ভেবে দেখল, পরীক্ষাটা বড়ই জরুরি। ভাল রেজাল্ট না করলে একটা সাদামাটা অধ্যাপনার চাকরিও জুটবে না। আর সেটা না জুটলে যে বন্যাকে নিয়ে ভেসে যাওয়ার স্বপ্নটাও ভেসেই যাবে এই কান্ডজ্ঞান তার হয়েছে। পাস করে চাকরি পেলেই বন্যাকে বিয়ে করে ফেলবে স্থিরনিশ্চয় হয়ে সে ফের বইখাতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখনও দু মাস বাকি ছিল পরীক্ষার এবং তার মেধাও তীক্ষ্ণ। দিন পনেরো বাদে বন্যা একদিন দেখা দিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তারপর আর আসেনি। বারকয়েক ফোন করেছিল জ্ঞান, কিন্তু বন্যাকে বাড়িতে পায়নি।

পৃথিবীতে যত প্রেমের ঘটনা ঘটেছে, ঘটছে এবং ঘটবে সেগুলোর চার থেকে ছয় রকমের প্যাটার্ন আছে। তার মধ্যে সরলতম হল প্রেমে পড়া এবং বিনা বাধায় বিয়ে হয়ে যাওয়া। তার ও বন্যার প্রেমটি এই সরলতম পথেই পরিণতির দিকে যাচ্ছিল। যদিও তখনও জ্ঞান বন্যার ঠিকানাটাও ভাল করে জানে না এবং তার পরিবার সম্পর্কেও পরিষ্কার ধারণা ছিল না। কিন্তু সেটা তো পটভূমি মাত্র, ততখানি গুরুত্ব ছিল না তার। আর বন্যার সেই অজ্ঞাত জীবনাংশে কবে কখন যে একটি রুক্ষ চোয়াড়ে শক্ত চেহারার দীর্ঘকায় যুবকের আকস্মিক আবির্ভাব ঘটেছিল তা সে জানতেও পারেনি। বরাত মন্দ, সেই ছেলেটা কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ, বিশাল বেতনের চাকরি করে এবং বছর বছর সিলিকন ভ্যালিতে যায়।

পরীক্ষার পরও যখন বন্যার হদিস পাচ্ছিল না সে তখন নবীনবাবুকে একদিন সরাসরি জিজ্ঞেস করে, বন্যা অনেকদিন আসেনি, না?

নবীনবাবু সকালে খবরের কাগজ পড়ছিলেন, তাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, না, তার এখন সময় হচ্ছে না। বিয়ের কথাটথা চলছে তো। ভীষণ ব্যস্ত।

জ্ঞান ঢোঁক গিলে বলল, বিয়ে?

হ্যাঁ, তাই তো শুনছি। আজকাল তো সব ভাবসাবের বিয়ে, মা-বাবার কিছু করার থাকে না। তবে ছেলেটি শুনছি ভাল।

জ্ঞানের ভিতরটা অন্ধকার হয়ে গেল। আর তার পরেই বুকের বাঁ ধারে একটা তীব্র যন্ত্রণা টের পেল সে। একবার ভাবল নবীনবাবুর সামনেই সে বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। শরীর কাঁপছে থরথর

করে, মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে, নিরালম্ব মনে হচ্ছে নিজেকে।

কী হল হে! শরীর খারাপ নাকি?

ওই অবস্থাতেও সে একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, না না ঠিক আছে...

বলে প্রায় অন্ধের মতো নেমে এল নীচে। দাঁড়ানোর শক্তি ছিল না। সোজা বিছানায় শুয়ে এক ঘোর বিকারের অবস্থা তার। একবার মনে হচ্ছে, গিয়ে বন্যাকে খুন করে আসে। একবার মনে হচ্ছে নিজেই গলায় ফাঁসি দেয়। এরকম কিছু যে হতে পারে এটা তার কোনও ভাবেই কোনও কল্পনাতেই আসেনি। বড় সহজেই তো ধরা দিয়েছিল বন্যা। তা হলে কী হল?

ঘোরটা কাটতেই সে উঠে বন্যার বাড়িতে যাবে বলে তৈরি হতে গেল। পারল না। মাথা ঘুরে পড়ে গেল মেঝের ওপর। তারপর অনেকটা টকজল বমি হল তার। রুমমেটরা ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দিল। সেই শোওয়া যেন শরশয্যার মতো। কিন্তু ওঠার সাধ্য ছিল না তার। ঘণ্টা কয়েক ওইভাবে ঝিম ধরে শুয়ে ভিতরের অস্থিরতায় ছটফট করা ছাড়া কী করতে পারত সে?

পরদিন সকালে দুর্বল শরীরেই সে বেরিয়ে পড়ল। বন্যার বাড়ির ঠিকানা আবছা মনে ছিল। খুঁজে খুঁজে নিউ আলিপুরের একটা ফ্ল্যাটবাড়ির দোতলায় সে যখন হানা দিল তখন সকাল সওয়া সাতটা। কারও বাড়িতে যাওয়ার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত সময় নয়।

এক ভদ্রমহিলা দরজাটা, সামান্য ফাঁক করে জ্ঞানকে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কাকে চাই?

বন্যা আছে?

আপনি কোথা থেকে আসছেন?

বন্যা আমার বন্ধু। ওর সঙ্গে একটা জরুরি দরকার।

ভদ্রমহিলার চোখজোড়া সন্দিহান এবং তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছিল। সেদিন সকালে জ্ঞানের চেহারাটাও ছিল সন্দেহজনক। দাড়ি কামানো ছিল না, চুলে চিরুনি ছোঁয়াতে ভুলে গেছে, পোশাকে পারিপাট্য নেই। সন্দেহ হতেই পারে।

আপনার নাম?

জ্ঞানাঞ্জন।

এখন তো দেখা হবে না। বন্যা ঘুমোচ্ছে।

মাথায় আগুন জ্বলছে। জ্ঞানের ইচ্ছে হয়েছিল দরজাটা জোর করে

ধাক্কা দিয়ে খুলে ভিতরে ঢুকে পাগলের মতো চিৎকার করতে। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, কখন উঠবে?

তার কোনও ঠিক নেই। ও অনেক রাত অবধি জেগে পড়াশুনো করে। সকালে উঠতে অনেক দেরি হয়।

কত দেরি? আটটা-নটা?

বললাম তো তার কোনও ঠিক নেই। দশটা-এগারোটাও হতে পারে।

ঠিক আছে। আমি তা হলে এগারোটার সময়ে আসব।

ভদ্রমহিলা জবাব না দিয়ে পট করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

জ্বলতে জ্বলতে নেমে এল জ্ঞান, এত রাগ, এত হতাশা এবং বুকভরা এত শূন্যতা সে কখনও নিজের মধ্যে টের পায়নি এতদিন। রাত থেকেই প্রায় উপোস করে ছিল সে। বন্যাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাগলের মতো এলোমেলো হাঁটল। সময় কাটতে চাইছিল না আর। হাঁটতে হাঁটতে কালীঘাট রেলস্টেশনে এসে খানিকক্ষণ বসে রইল প্ল্যাটফর্মের একটা বেঞ্চে। কতবার যে মরতে ইচ্ছে হয়েছিল তার তা বলার নয়।

বেলা এগারোটায় সে ফের হানা দিল বন্যাদের ফ্ল্যাটে। সেই ভদ্রমহিলাই ফের দরজা ফাঁক করে তাকে দেখলেন।

কী চাই?

আমি সকালে এসেছিলাম। বন্যা কি উঠেছে?

সে তো একটু আগে বেরিয়ে গেল।

বেরিয়ে গেল! আমার যে এগারোটার সময়ে আসার কথা ছিল! বলেননি?

গলায় হয়তো হিংস্রতা এবং রাগ দুটোরই প্রকাশ ঘটেছিল। ভদ্রমহিলা যেন চমকে উঠলেন। থতমত খেয়ে বললেন, বলেছি, ওর একটা জরুরি কাজ ছিল বলে বেরিয়ে গেছে।

কোথায় গেছে?

বলে তো যায়নি। তবে কোনও বন্ধুর বাড়িতে পড়তে যায়।

হঠাৎ ভদ্রতার মুখোশটা খুলে ফেলল জ্ঞান। তার ধৈর্য ছিল না আর। চিৎকার করে বলল, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন! ও বাড়িতেই আছে।

বোধহয় জ্ঞানের গলার স্বর আর চোখমুখের ভাব দেখে ভদ্রমহিলা ভয় পেয়ে গেলেন এবং টপ করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। আধুনিক দরজা, বন্ধ করলেই লক হয়ে যায়। জ্ঞান এক মুহূর্ত অপেক্ষা করেই বার বার কলিং বেল বাজাতে লাগল। দরজা আর খুলল না। জ্ঞান তখন দুম দুম করে দরজায় প্রথমে ধাক্কা এবং তারপর কয়েকটা লাথি মারল।

শুনতে পেল, ভদ্রমহিলা ভিতরে চিৎকার করে কাউকে বলছেন, ডাকাত! ডাকাত! শিগগির এসো তোমরা।

উলটো দিকের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে একজন গম্ভীর চেহারার বুড়ো মানুষ বোধহয় এসে একটা পেল্লায় ধমক দিলেন জ্ঞানকে, এটা কী হচ্ছে হে! অ্যাঁ! কী হচ্ছে এটা?

সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত জ্ঞান হঠাৎ বুঝতে পারল সে একটা ভুল করে ফেলছে। এভাবে গায়ের জোরে হবে না। সুতরাং আর অপেক্ষা না করে সে তর তর করে নেমে এল। ভাগ্যিস এসব অভিজাত পাড়ায় লোক জড়ো হতে সময় লাগে।

কিন্তু যুক্তি আর বুদ্ধি তখন তার আহত অহং এবং যন্ত্রণার কাছে বেশিক্ষণ টেকেনি। পরদিনই সে আবার গেল এবং বন্যার ফ্ল্যাটে না গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল রাস্তায়।

কাজটা সহজ নয়। সকাল সাতটায় পৌঁছে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পরই সে বুঝল এই নির্জন পাড়ার মুষ্টিমেয় মানুষেরা তাকে লক্ষ করছে। তার মুখের উদ্‌ভ্রান্ত ভাব, উচাটন চলাফেরা সন্দেহ উদ্রেক করতেই পারে। বন্যাদের দোতলার ফ্ল্যাটের দিকে সারাক্ষণ নজর রাখাও সোজা কাজ ছিল না। ঊর্ধ্বমুখে আর কতক্ষণ থাকা যায়। সেটা শোভনও নয়। তবু সেসব তার মনে হচ্ছিল না। বন্যাকে মুখোমুখি ধরাই তার সবচেয়ে বেশি দরকার তখন। তারপর যা হয় হোক।

বন্যাদের ফ্ল্যাটবাড়ির সদর দরজা দিয়ে বহু লোক বেরোল। বাজারে গেল এবং ফিরে এল। ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজে গেল। লোকে অফিসে বেরোতে লাগল। রাস্তায় এমুড়ো ওমুড়ো বার বার ফুটপাত বদল করে হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ব্যথা হয়ে যাচ্ছিল জ্ঞানের। তার সন্দেহ হচ্ছিল, জানালা দিয়ে বন্যা তাকে লক্ষ করেছে এবং ইচ্ছে করেই বেরোচ্ছে না।

সকাল থেকে যে কিছুই খায়নি তা পর্যন্ত খেয়াল ছিল না জ্ঞানের। পেট চুঁই চুঁই করছে খিদেয়। জলতেষ্টায় পাপোষের মতো খসখস করছে জিব আর গলা। তবু জ্ঞান এক পলকের জন্যও বন্যাদের সদর দরজা থেকে চোখ সরায়নি।

বেলা বারোটা নাগাদ আচমকা তাকে আগাপাশতলা চমকে দিয়ে বন্যা বেরিয়ে এল। পরনে নীলরঙা একটা শাড়ি। অনেকটা দূরে চলে গিয়েছিল জ্ঞান। দূর থেকে বন্যাকে দেখতে পেয়েই সে উন্মাদের মতো ছুটতে শুরু করল। কী করবে, কী বলবে তার তখনও ঠিক ছিল না। শুধু

বন্যাকে তার নাগাল পাওয়াই তখন দরকার। হয়তো গুহামানবের মতো চুল ধরে টেনে নিয়ে যাবে, হয়তো মেরুদণ্ডহীন প্রেমিকের মতো পায়ে গড়িয়ে পড়বে, হয়তো উন্মাদের মতো জড়িয়ে ধরবে প্রকাশ্য রাস্তায়।

কিন্তু একটা চূড়ান্ত করেই ফেলত সে। শুধু তার বন্যায় ভরা চোখ লক্ষ করেনি, বন্যার পিছনে এক দীর্ঘকায় এবং কর্কশ চেহারার যুবকও বেরিয়ে এসেছিল।

উন্মত্ত জ্ঞানের পথ আটকে দাঁড়াল সে-ই।

কী চান আপনি?

অবাক হয়ে ছেলেটার দিকে চেয়ে জ্ঞান বলল, ওর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

না, কোনও কথা নেই। আপনি চলে যান।

খুব শান্ত শীতল গলাতেই বলল ছেলেটি।

জ্ঞান ক্লান্ত গলাতে চেঁচিয়ে বলল, আপনি কে? আপনার কী অধিকার?

ছেলেটা হাত বাড়িয়ে তার জামার সামনে বুকের কাছটা শক্ত মুঠোয় খামচে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, কাম টু ইয়োর সেনসেস। আপনি পাগলামি করছেন।

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য জ্ঞানাঞ্জন তখন ছেলেটাকে একটা ঘুষি মারার চেষ্টা করে। জীবনে সে কখনও মারপিট করেনি। দেখতে সুন্দর হলেও তার গায়ের জোর বলতে কিছু ছিল না। সে নিরীহ, শান্তিপ্রিয় ভাল ছেলে মাত্র। ঘুষিটা লাগল না।

ছেলেটা বাঁ হাতে তার গালে আচমকা ঠাস করে একটা বিশাল চড় কষিয়ে দিল। চোখে অন্ধকার দেখল জ্ঞান।

পিছন থেকে বন্যা বলল, থাক, মেরো না। লেট হিম গো।

ছেলেটা জ্ঞানকে ফের একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, ফের যদি এখানে ঘুরঘুর করতে দেখি তা হলে মেরে পাট করে দেব, বুঝলেন? যদি ভাল চান তো সরে পড়ুন। আর আসবেন না।

জ্ঞানের মাথা ঝিমঝিম করছিল। টসটস করে ধারায় জল পড়ছিল চোখ দিয়ে। সে শুধু বলেছিল, কিন্তু আমি কী করেছি? আমি কী করেছি তা ও একবার বলুক আমায়।

না, বলবে না। আপনি অত্যন্ত অন্যায় করেছেন। আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। যদি আপনাকে পুলিশে দিই তা হলে কী হবে জানেন?

না, জ্ঞান তা জানে না।

ছেলেটা তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে ছেড়ে দিল। জ্ঞান চিত হয়ে পড়ে গেল ফুটপাতে। সকাল থেকে খাওয়া নেই। শরীর দুর্বলই ছিল, পড়ে সে কিছুক্ষণ উঠতেই পারল না। তার সামনে দিয়ে দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চলে গেল।

কিছু করার ছিল না জ্ঞানের। ধীরে ধীরে সে উঠল একসময়। অনেকক্ষণ ধরে শ্বাসক্রিয়া স্বাভাবিক করতে বড় বড় শ্বাস নিল। তারপর ফিরে এল।

রাত্রেই নবীনবাবু তাকে ডেকে পাঠালেন, মুখ গম্ভীর।

তোমাকে ভাল ছেলে বলেই তো জানতাম। কিন্তু এটা তোমার কীরকম আচরণ বলো তো!

জ্ঞান গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জবাব দিল না।

ভালবাসা কি একতরফা হয়? তোমার আত্মমর্যাদা বলে কিছু নেই? যখন বুঝতে পারছ একটা মেয়ে তোমাকে পছন্দ করছে না তখন ওরকম হ্যাংলার মতো গিয়ে তাকে ডিস্টার্ব করছ কেন? প্রেম করা ছাড়া কি তোমাদের আর গুরুতর কোনও কাজ নেই নাকি?

জ্ঞান স্খলিত কণ্ঠে বলল, বন্যার সঙ্গে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল।

নবীনবাবু অবাক হয়ে বললেন, আন্ডারস্ট্যান্ডিং! তোমাদের মধ্যে তো দু-একদিনের বেশি দেখাই হয়নি।

আপনি জানেন না, বন্যা আমার কাছে আসত, আমরা বিয়ে করব বলে ঠিক করেছিলাম।

নবীনবাবু বিচক্ষণ মানুষ। গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ কী চিন্তা করে বললেন, আমার নাতনি বলেই যে আমি তার সমর্থক তা ভেবো না। বন্যা যে একটু চঞ্চলমতি তা আমি জানি। ছেলেছোকরাদের সঙ্গ সে পছন্দ করে বলেই শুনেছি। তোমার কথা আমি অবিশ্বাস করছি না। মোড়ের পানওয়ালা আমাকে একদিন বলেছিল বটে যে দুপুরবেলা বন্যাকে এ গলিতে ঢুকতে দেখেছে। অথচ সে আমার কাছে আসেনি। আমি একটু অবাক হয়েছিলাম। বিশ্বাস করিনি। এখন দেখছি কথাটা মিথ্যে নয়।

জ্ঞানের চোখ দিয়ে ফের টসটস করে জল পড়ছিল। জ্ঞানবয়সে সে কখনও কাঁদেনি।

নবীনবাবু বললেন, এ যুগের ছেলেমেয়েরা তো এসব তেমন গায়ে মাখে না। তাদের মনের গভীরতা নেই বলে একটা ছেড়ে আর একটা ধরতে অসুবিধে হয় না। যা হওয়ার হয়ে গেছে, ওটা এখন ভুলে যাও।

খবর পেয়েছি বন্যার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। তুমি যদি বাধাটাধা দিতে যাও তা হলে তুমিও বিপদে পড়বে। মাথা ঠান্ডা করো, দু-চারদিনের জন্য বাইরে থেকে ঘুরে এসো। নারীচিন্তা না করাই ভাল। ওতে কোনও সারবস্তু নেই।

তার জীবনে বন্যার প্রবেশ ও প্রস্থান অনেকটা উল্কার মতোই। এত তাড়াতাড়ি তাদের ভাব থেকে ভালবাসা হল। এত তাড়াতাড়ি ভালবাসা থেকে ঘনিষ্ঠতা গভীর হল, হয়ে গেল দেহসম্পর্ক পর্যন্ত। এবং তারপরই এত তাড়াতাড়ি ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল যে জ্ঞান ব্যাপারটা ভাল করে বুঝেই উঠতে পারছিল না। যেন একটা জেট প্লেন তার জীবনে ঢুকে সব উলটেপালটে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। বিস্তর ভাঙচুর জোড়াতালি মেরামত করতে হবে তাকে, সরাতে হবে বর্জ্যস্তূপ। মনের গভীর অবসাদ তাকে দুর্বল করে ফেলেছিল খুব। মরার ইচ্ছে হত, মাঝে মাঝে রাগে চারদিকের সবকিছু ধ্বংস করে ফেলতে ইচ্ছে হত। বাবা-মার কাছে যেতে তার ভয় হচ্ছিল, তার মুখচোখ দেখে তারা যদি কিছু টের পায়। অথচ পরীক্ষার পর তার বাড়ি যাওয়ার কথা। মা-বাবা অপেক্ষা করে আছে। অপেক্ষা করে আছে তার ছোট দুটি যমজ বোন। বিপর্যস্ত মস্তিষ্কে কোনও সিদ্ধান্তই নিতে পারছিল না সে। বন্যার প্রেমিকের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার তিন দিন বাদে সে বন্যার একটি চিঠি পেল ডাকে। বন্যা লিখেছে, যা কিছু ঘটেছে তার জন্য সে ক্ষমা চায়। অলকের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়ে ছিল অনেকদিন আগে থেকেই। বন্যা জ্ঞানকে তার একজন ভাল বন্ধু বলে মনে করে। ভাল বন্ধু হয়েই জ্ঞান যেন থাকে। ইত্যাদি।

জ্ঞান চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।

স্বাভাবিক হতে অনেক সময় লেগেছিল তার। আর পুরোপুরি স্বাভাবিক সে হলই বা কবে? জ্ঞান পরিষ্কার টের পেত সে আর আগেকার জ্ঞান নেই। কেমন বেপরোয়া, মেজাজি, খেয়ালি, মারমুখো এক মানুষে পরিণত হয়েছে। আর মেয়েদের সম্পর্কে তার ধারণার ঘটেছে আমূল পরিবর্তন। সেই পরিবর্তনটাকে আজও বুঝতে পারে না জ্ঞান। মেয়েদের প্রতি তার দেহগত আকর্ষণটাই প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। কোনও রোম্যান্টিক চিন্তাই মনে আর আসে না।

দুই

দাদা।

হ্যাঁ।

আজ কি তুমি একটু ফিউজ হয়ে আছ?

আরে না। জাস্ট টায়ার্ড।

বাজে বোকো না। ইউ আর নট ইন মুড।

জ্বালালি। কী বলবি বল।

জাস্ট একটু কুশল প্রশ্ন করতে এলাম। ইজ এভরিথিং ও কে?

ও কে।

ইভন আফটার দ্যাট টেলিফোন কল?

জ্ঞান প্রমাদ গুনল, বলল, বড্ড জ্যাঠা হয়েছিস তো! ও একজন ওল্ড ফ্রেন্ড।

যাক বাবা, ওল্ড ফ্লেম নয়।

পাগল নাকি? এখন যা।

এখন কটা বাজে জান অঙ্কেশ্বর?

ক'টা?

আটটা।

তাতে কী হল। আটটায় কী হবে?

হবে নয়, হয়ে গেছে।

কী হয়ে গেছে বলবি তো।

তোমার প্রিয় হিন্দি সিরিয়াল 'প্যার সে বোলো'।

তাই তো! ইস, খেয়াল ছিল না, ডাকিসনি কেন?

ডাকব কেন? দেখলাম একটা ফোন কল তোমাকে কতটা পেনসিভ করে ফেলেছে!

বাজে বকবি না তো! যত ধিঙ্গি হচ্ছে তত আস্পর্ধা বাড়ছে।

বিদ্যা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আস্পর্ধা কেন বাড়ে জান?

কেন আবার! আদরে বাঁদর হয়েছ।

ঠিক তাই। আর সেটা সবচেয়ে বেশি তুমিই আমাদের দিয়েছ।

ভুল করেছি।

এখন তো আর ভুল শোধরাতে পারবে না।

পারব না কেন? মাঝে মাঝে একটু কান মলে দিতে হবে এবার থেকে।

পারবে?

পারতে হবে।

জীবনে কারও কান মলেছ কখনও?

মলিনি বলেই কি মলব না নাকি?

মার কাছে শুনেছি, আমরা যখন সবে হাঁটতে শিখেছি তখন একবার পড়ে গিয়ে আমার দুধের দাঁত উপড়ে রক্ত পড়েছিল বলে তুমি এক ঘণ্টা ধরে কেঁদেছিলে!

উফ্! জ্বালালি তো! তোর মতলবটা কী বলবি?

আজ একটুও আড্ডা মারছ না আমাদের সঙ্গে। আর আজ আমি কত কষ্ট করে তোমার জন্য তন্দুরি চিকেন করেছি তা জান! তন্দুরি করব বলে মাকে অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে রাজি করিয়ে ইলেকট্রিক ওভেন কিনিয়েছি।

জ্ঞান একটু হাসল, থ্যাংক ইউ। মাকে বলতে গেলি কেন, আমাকে বললেই তো ওভেন কিনে দিতাম।

তাতে সারপ্রাইজ থাকত না। ইফ ইউ আর ইন এ গুড মুড, তা হলে আমি আর দয়া তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।

বল না।

দাঁড়াও, আগে দয়াকে ডাকি। বেচারা মায়ের চুল বাঁধতে বসেছে।

একটু বাদেই দুই বোন একসঙ্গে ঘরে এল। একজন জানালার গ্রিল ধারে দাঁড়াল, অন্যজন আলমারিতে ঠেস দিয়ে।

তার এগারো বছর বয়সে যখন তার দুটি যমজ বোন হল তখন জ্ঞান অবাক, দুটো বোন একসঙ্গে! নাক সিঁটকে সে বলেছিল, এঃ বোন! বোন দিয়ে কী হবে? ভাই হলেও না হয় হত! খেলতে পারতাম।

নবলা বলেছিল, কেন, বোনের সঙ্গে বুঝি খেলা যায় না?

দুর! মেয়েরা কি খেলতে পারে?

আর বোনেরা যে তোকে ভাইফোঁটা দেবে? ভাই হলে দিত?

জ্ঞান কথাটা শুনে একটু ভাবনায় পড়ল। একটু চুপ করে থেকে বলল, কবে থেকে দেবে?

একটু বড় হলেই দেবে। কত ভালবাসবে তোকে দেখিস!

সে পড়তে বসলে দুটো বোন একসঙ্গে হামা দিতে দিতে চলে আসত তার কাছে। চেয়ার ধরে দাঁড়াত, নানারকম দুর্বোধ্য শব্দ করে তার মনোযোগ আকর্ষণ করত। আর একটু বড় হয়ে দুই বোন দুটি বেড়ালছানার মতো তার দু'পাশে বসে অঙ্ক শিখত।

মাঝে মাঝে জ্ঞানের মনে হত, তার বোনদুটো বড্ডই ছোট।

পিঠোপিঠি হলে বরং একটু বন্ধুর মতো হতে পারত। এদের সঙ্গে তার যে প্রজন্মের পার্থক্য!

কিন্তু বোনেরা যখন দশ-বারো বছরের হল তখনই তার ধারণাটা কত ভুল তা বুঝতে পারল জ্ঞান। বয়সের তুলনায় মেয়েদের মন অনেক তাড়াতাড়ি বাড়ে। প্রজন্মের পার্থক্যটা আর একদম বোঝা যেত না। দুই বোন দাদার পেছনে লাগা শুরু করল। সমানে সমানে ঠাট্টাইয়ার্কি। গুরুজন বলে মোটেই গ্রাহ্য নেই। অঙ্ক কষত বলে তার নাম দিল অঙ্কেশ্বর। আবার বাড়ি এলে এ দুজনেই তাকে ঘিরে রাখে।

যমজ বলেই বোধহয় ওরা সব কাজ একসঙ্গে করে। দু'জনে দু'জনকে ছেড়ে থাকেই না এবং ওদের কখনও ঝগড়া হয় না। মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে জ্ঞান বলে, তোরা আমার চেয়েও দু'জন দু'জনকে বেশি ভালবাসিস।

শুনে দুই বোন চিমটি আর কাতুকুতু দিয়ে অস্থির করে তোলে তাকে।

মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে মাকে এও বলে জ্ঞান, এদের দু'জনের যা ভাব দেখছি মা, বিয়ের পর তো আলাদা আলাদা সংসারে থাকতে পারবে না। দু'জনকে একই পাত্রে পাত্রস্থ করার ব্যবস্থা করো।

আবার কাতুকুতু আর চিমটি।

আজ দুই বোনের দিকে পর্যায়ক্রমে চেয়ে জ্ঞান বলে, ইয়েস?

দয়া নিজের চুলের গুছি নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, আমরা ভেবে দেখলাম, তুমি হচ্ছ এ বাড়ির সবচেয়ে প্রিভিলেজড সিটিজেন। ঠিক তো!

বুঝিয়ে বল।

এ বাড়ির সবাই অর্থাৎ মা-বাবা তোমার ব্যাপারে ভীষণ পার্টিজান।

তাই নাকি?

নিশ্চয়ই। এক কথা তুমি ছেলে, এ দেশে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে সবসময়ই বেশি প্রিভিলেজ পায়।

একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে জ্ঞান বলে, কথাটা মিথ্যে নয়। তবে শুধু মা-বাবাই নয়, এই বাড়ির আরও দু'জন মেম্বারও আমাকে সবসময় প্রায়োরিটি দেয়। তারাও পার্টিজান এবং বেশিই পার্টিজান।

ওঃ, কথার মাঝখানে আনওয়ান্টেড কথা বলবে না।

ঠিক আছে। এবার বল।

তুমি এই ফ্ল্যাটের সবচেয়ে বড় এবং ভাল ঘরখানা দখল করে আছ। ঠিক তো?

সপ্তাহে তিনদিনের জন্য মাত্র।

এটা কোনও কথা নয়। ঘরটা তোমার কিনা বলো।

বটেই তো।

এই ঘরে দামি মিউজিক সিস্টেম এবং কম্পিউটার আছে কিনা বলো।

আছেই তো।

তুমি কি জান যে তুমি না থাকলে মা আমাদের এই ঘরে ঢুকতে দেয় না এবং কোনও জিনিস ধরতেও দেয় না!

জানি।

এটা অবিচার কিনা বলো।

ঠিক আছে, আমি মাকে বলে দেব, এবার থেকে তোরা এ ঘরে ঢুকে যত খুশি দাপাদাপি করিস।

ঠিক তো!

যাও, পাক্কা। প্রমিস।

বিদ্যা এবার খুব করুণ স্বরে বলল, আসলে একটা প্রবলেম হয়েছে।

কী প্রবলেম?

আমাদের এক বন্ধুর রাত আটটায় আসার কথা।

তাতে কী?

সে কতগুলো সি ডি নিয়ে আসছে।

ও।

আমরা সি ডি-গুলো তোমার কম্পিউটারে চালিয়ে একটা সিনেমা দেখব। ওয়েস্টার্ন মিউজিক্যাল।

একটু হেসে জ্ঞান বলে, ঘরটা ছেড়ে দিতে হবে, এই তো!

খুব অসুবিধে না হলে।

থাক, আর ভদ্রতা করতে হবে না, যাচ্ছি।

জ্ঞান উঠতে যাচ্ছিল, বিদ্যা বলল, আহা, এখনই উঠছ কেন? আমাদের বন্ধুটির সঙ্গে একটু আলাপ করে যাও। বাইরের ঘরে বসে আছে , ডাকছি।

জ্ঞান রাগ করে বলল, বন্ধুকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখে ধানাইপানাই করছিলি কেন? তোরা যে কী!

বন্ধুটি বসে থাকাটা এনজয় করছে। মাদার ইজ গ্রিলিং হার।

সে কী! কেন?

আমাদের কোনও বন্ধু এলেই মা তাকে একটু গ্রিল করে। কোথায় থাক, বাড়িতে কে কে আছে, জাত কী, বাবার রোজগার কেমন। অল

আনপার্লামেন্টারি কোশ্চেনস। সতীর অবশ্য নতুন নয়, মায়ের পাল্লায় কয়েকবারই পড়েছে।

সতী! মানে সেই মেয়েটি নাকি যে আমার কাছে একদিন অঙ্ক বুঝতে এসেছিল।

বিদ্যা গম্ভীর হয়ে বলল, সে-ই। এবং তুমি তাকে যথেষ্ট অপমান করেছিলে।

অপমান করব কেন? শুধু বলেছিলাম অঙ্কে তুমি খুব কাঁচা।

সেটা কি অপমান নয়?

মেয়েটা অঙ্ক বুঝবে কী, খাতায় মুখ ঢেকে হাসছিল যে! অত অমনোযোগ থাকলে কি অঙ্ক শেখা যায়?

সকলেরই কি অঙ্কের মাথা থাকে তোমার মতো? তার ওপর ও ইতিহাসের ছাত্রী।

যাঃ তবে অঙ্ক শেখে কেন?

শখ, বসো, ওকে ডাকছি।

শ্যামলা স্নিগ্ধ চেহারার মেয়েটি আজও হাসছিল। অনভ্যস্ত হাতে একটা প্রণামও করে ফেলল টপ করে।

মেয়েদের সামনে সে বরাবরই একটু লাজুক। তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিতে নিতে বলল, থাক থাক, ভাল আছ?

হ্যাঁ। আপনি ভাল আছেন?

তোমরা বসে সিনেমা দেখো, আমি বরং ও ঘরে গিয়ে মায়ের সঙ্গে একটু গল্প করি।

মেয়েটা ইতিহাসের ছাত্রী, অথচ অঙ্ক বুঝতে এসেছিল তার কাছে! এর মানেটাই বুঝতে পারল না জ্ঞান। তার বিচ্ছু দুটি বোন কি তাকে এপ্রিল ফুল করতে চেয়েছিল? সেটা এপ্রিল মাস ছিল কিনা তা অবশ্য মনে নেই জ্ঞানের। বোনদুটো তাকে প্রায়ই তো বোকা বানায়।

ডিভানে বসে নবলা মভ রঙের উলে একটা সোয়েটার বুনছে।

আয় তো, তোর মাপটা দেখি।

কার জন্য বুনছ?

তোর জন্য।

আমি আর কত সোয়েটার পরব বলো তো! গোটা দশেক তো বুনলে এই নিয়ে।

বাবাঃ, ঝাড়গ্রামে যা শীত!

কিন্তু মানুষ তো আমি একটা।

তাতে কী? এই ডিজাইনটা বড্ড ভাল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরবি। কলেজ করিস, ফিটফাট থাকতে হয় না?

জ্ঞান হাসল, আমার কলেজ যদি দেখতে! বেশির ভাগই তো আদিবাসী ছেলেমেয়ে। অনেকের ভদ্র পোশাকই জোটে না।

তা হোক। তুই তো প্রফেসর। তোর ফিটফাট থাকা দরকার।

মায়ের সঙ্গে তর্ক বৃথা। ছেলের প্রতি নবলার ভালবাসা একরোখা, আপসহীন এবং পক্ষপাতদুষ্ট। জ্ঞান সেটা খুব একটা উপভোগ করে না।

টি ভি-টা বন্ধ করে দেব?

না মা থাক। তুমি দেখছ তো!

সবসময়ই তো দেখছি। বরং কথাটথা বল।

সপ্তাহে সপ্তাহে কি নতুন কথা তৈরি হয়? ওসব জায়গায় কিছু তেমন নতুন ঘটনা ঘটেও না। কালকের দিনটা ঠিক আজকের মতোই। মনে হয় থেমে আছি, দিন কাটছে না, সময় কাটছে না।

ধারেকাছে সিনেমা হলটল নেই?

ওসব দেখতে ইচ্ছে করে না। বরং নির্জন, ঘটনাহীন সময় কাটাতে ভালই লাগে। দুবেলা ছাত্রছাত্রী পড়াতে হয়, সময় কেটে যায়।

কেমন বাড়ি? আমরা যদি বেড়াতেটেড়াতে যাই, গিয়ে থাকতে পারব তো!

পারবে না কেন? তবে বাথরুম নেই, বলেইছি তো সব।

একটা ভাল বাড়ি দেখ না কেন!

সেটা গ্রামদেশ, ভাল বাড়ি বলতে কিছু নেই। তোমরা গেলে কষ্ট পাবে।

তোরও তো কষ্ট হয় থাকতে!

আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।

কোনও শহুরে মেয়ে গিয়ে যদি সেখানে থাকতে না পারে তা হলে বউ নিয়ে যাবি কী করে?

বউ! বউয়ের প্রশ্ন উঠছে কেন?

আঠাশ বছর বয়স হতে চলল, মনে রেখো। অখাদ্য খেয়ে খেয়ে চেহারার যা ছিরি হচ্ছে দিন দিন, রংটাও কত কালো হয়ে গেছে। এভাবে একা একা আমি আর কিছুতেই অত দূরে পড়ে থাকতে দেব না তোকে।

তা হলে যে চাকরি ছেড়ে চলে আসতে হয়।

চাকরি ছাড়ার কী হল? বিয়ে করে বউ নিয়ে যা।

সেই পুরনো কথা!

মন্দ কথা তো আর নয়। যাকে পছন্দ তাকেই বিয়ে কর, কেউ বারণ করবে না। আমার বা তোর বাবার জাতপাত নিয়েও কোনও খুঁতখুঁতনি নেই। ভদ্রস্থ হলেই হল।

ভদ্রস্থ মানে?

এই আমাদের মতো।

আদিবাসী চলবে?

নবলা হেসে ফেলে, তারপর বলে, জুটেছে নাকি কেউ?

চাইলেই জোটে।

এই বন্যা মেয়েটা কে রে?

জ্ঞান একটু হেসে বলে, তাই বলো! এতক্ষণ বন্যার কথা জানার জন্যই আঁকুপাঁকু করছিলে!

আহা, আঁকুপাঁকু আবার কী? পছন্দের হলে কি আর আপত্তি করব? কে রে মেয়েটা?

সে একজনের বউ।

বউ?

হ্যাঁ।

ও। তোকে তো কখনও কোনও মেয়ে ফোন করে না, তাই ভাবলুম কোনও গার্লফ্রেন্ড জুটল কিনা।

সে একসময় আমার বন্ধুই ছিল। বিয়ে হয়ে গেছে।

কাউকে পছন্দ হলে আমাকে বলিস কিন্তু। মাকে সব বলতে হয়।

পছন্দ আগে হোক তো। ’

ওখানকার কোনও মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়নি তো!

জ্ঞান একটু হাসল। তারপর বলল, ভয় পাও মা?

তা নয় বাবা, ভয় পাব কেন? বলেই তো দিয়েছি যাকে খুশি বিয়ে কর, বাধা দেব না।

জ্ঞান চুপ করে থাকে। বীণা সাইকেলে করে রোজ কলেজে আসে। অনেক দুর থেকে। জ্ঞানের কাছে বিকেলের ব্যাচে প্রাইভেট পড়ে বাড়ি ফিরে যায়। কালোর মধ্যেও তার মুখশ্রী দেখার মতো চমৎকার। তেমনই বেতের মতো চেহারা, ঝকঝক করছে দাঁত, পরিষ্কার সরল চোখ, লাজুক, সরল, পরিশ্রমী। খুব গরিব ঘরের মেয়ে নয়। জোতজমা আছে তাদের, গোরু আর মোষ আছে। ছাত্রীর অধিকারের সীমানা সে খুব সামান্যই মাঝে মাঝে পার হয়। মেটে আলু কী করে কষ ছাড়িয়ে রান্না করতে হয় তা একদিন সারা বেলা জ্ঞানকে শিখিয়েছিল সে, মাঝে মাঝে

বাড়ি থেকে বোতলে করে দুধ নিয়ে আসে তার জন্য। সেটা গুরুদক্ষিণা না প্রেম নিবেদন তা ভাল করে এখনও বুঝতে পারেনি জ্ঞান। তার দিক থেকে অনুকম্পামিশ্রিত সামান্য একটু প্রশ্রয় আছে মাত্র।

মাঝে মাঝে বীণা বলে, স্যার, আমাদের বাড়ি বেড়াতে যাবেন! বেশি দুর নয়, মাত্র বারো মাইল।

বারো মাইল মেয়েটা রোজ সাইকেলে যাতায়াত করে শুনে খুব অবাক হয়েছিল জ্ঞান প্রথমে।

বীণা হেসে বলল, আরও দূর থেকেও তো মেয়েরা আসে। সাবিত্রীর বাড়ি বিশ মাইল দূরে।

তোমার ভয় করে না? পথ তো নির্জন।

সব সময় নয়। দল বেঁধেই আসি। তবে কখনও কখনও একাও আসতে হয়। না, ভয় করে না।

বিপদ নেই?

তা আছে। কিন্তু ভয় পেলে কি চলে?

পুরনো দিনের নভেলে যেমন হত তেমনই একদিন আচমকা প্রবল জ্বরে পড়ে গিয়েছিল জ্ঞান। কলেজ থেকে জ্বর গায়ে ফিরে শুয়ে পড়ল। বিকেলের ব্যাচের ছাত্রছাত্রীরা পড়তে এলে বলে দিল, আজ আর পড়াতে পারব না।

সবাই চলে গেল। রয়ে গেল বীণা।

স্যার, আপনার এত জ্বর! কে দেখবে আপনাকে? এখানে যে ভাল ডাক্তারও নেই!

ঠিক হয়ে যাবে বীণা। আমার কাছে জ্বরের ওষুধ আছে। কলকাতা থেকে মা সব ওষুধপত্র দিয়ে দিয়েছে সঙ্গে।

তাও স্যার, মাথায় জল ঢালা দরকার। খাবেনই বা কী? জ্বর গায়ে তো রাঁধতে পারবেন না। আমি একটু থেকে যাই স্যার?

থাকবে? রাত হয়ে যাবে যে!

হোক স্যার, আমার কাছে টর্চ আছে।

পাগল! বারো মাইল একটা মেয়ে অন্ধকারে একা যেতে পারে নাকি? তুমি বাড়ি যাও, আমার অসুবিধে হবে না।

এখানে আমার এক দিদির শ্বশুরবাড়ি আছে। আমি রাতটা তাদের বাড়িতে কাটাতে পারব।

তোমার বাড়ির লোক যে ভাববে!

শেফালী এখনও যায়নি। ও আমাদের গাঁয়েই থাকে। ওকে দিয়ে খবর

পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তারপর ঠিক নভেলের গল্পের মতোই জল টেনে এনে তার মাথা ধুইয়ে দিল বীণা, মাথায় জলপট্টি লাগাল, রুটি তরকারি বানিয়ে খাওয়াল। রাত প্রায় দশটায় চলে গেল দিদির শ্বশুরবাড়ি। পরদিন কাকভোরে এসেই আবার লেগে পড়ল কাজে। তিনদিন লাগাতার ওই সেবার ভিতরে এমন একটা নিবেদন ছিল যে মনটা ভারী দুর্বল হয়ে গেল তার। যদি এই শ্রীময়ী মেয়েটিকে সে বিয়ে করে তা হলে ক্ষতি কী? এত সেবাপরায়ণা, পরিশ্রমী, স্নেহশীলা মেয়ে কি সহজে পাওয়া যায়?

কিন্তু জ্বর ছেড়ে যেতেই সেই আবেগটা উধাও হল। তবে বীণার যাওয়া-আসা বজায় ছিল। অসভ্য ধরনের মেয়ে নয়। ইশারা ইঙ্গিত করেনি কখনও। পোশাকআশাক খুবই সভ্য ধরনের। শিক্ষকের প্রতি সহজাত শ্রদ্ধার ভাবটিও আছে।

গত বছর শীতকালে বীণা তার বাড়িতে পিঠে খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছিল। দোনোমোনো করেও রাজি হয়েছিল জ্ঞান, এক চমৎকার উজ্জ্বল, শীতল সকালে ধার করা সাইকেলে বারো মাইল গেঁয়ো রাস্তা পেরিয়ে সে গিয়ে হাজির হল ভারী লক্ষ্মীশ্রীমণ্ডিত গেরস্তবাড়িতে। গোরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, ধানের মরাই, পুকুর, বাগান সব মিলিয়ে বেশ ভাল অবস্থা বীণাদের। কয়েক বিঘে জমিতে দুখানা দোতলা পাকা বাড়ি, তিন-চারটে মেটে বাড়ি। সবজিবাগান দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কী আদরযত্নই যে করল তারা তা কহতব্য নয়। ছেলেবুড়ো সবাই তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল। এমনকী বীণার মা-বাবা পর্যন্ত। যেন গুরুঠাকুরটি এসেছেন এমন ভক্তিভাব নিয়ে হাতজোড় করে দাঁড়ানো। এই আদর করতে এরাই জানে। শহুরে মানুষদের কাছে মানুষের এত দাম নেই আজকাল। বীণার চোখে মুখে সে কী বিহ্বলতা। খুশিতে, গৌরবে, উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়ছে। ঝকমক করছে দুটো চোখ। কী করবে তার দিশা পাচ্ছিল না। এই চা দিচ্ছে, এই ডাব নিয়ে আসছে, এই বেগুনি আর কুমড়ো ফুলের বড়া এনে হাজির করছে। আর পিঠে পায়েসের তো বন্যা।

শুধু অত ভালর মধ্যে একটা দৃশ্যই বড় ধাক্কা দিয়েছিল জ্ঞানকে। সে দেখেছিল, বীণার বুড়ি ঠাকুমা দাওয়ায় বসে গুড়গুড় করে তামাক খাচ্ছে। সে অঙ্কের মাস্টার, মনটা তাই সবসময় একটা হিসেবনিকেশ করে যায়। নানা জটিলতার ভিতর দিয়ে অঙ্ক সবসময়ই একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছোয়। তাকে পৌঁছোতেই হয়। সেই সিদ্ধান্তটাই আসল। কোনও একটা স্টেপ

ভুল হলে ভুল অঙ্ক কিছুতেই সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারে না।

ভেবে দেখলে সে বীণাকে ভালবাসে না। ভাল সে একবারমাত্র একজনকেই বেসেছিল। সেই ভালবাসা গুবলেট হয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু আজও চোখ বুজলেই কালো আকাশে চাঁদের মতো ওই একখানা মুখই ভেসে ওঠে। হয়তো এটাই জ্ঞানের জীবনের অভিশাপ। এই নিরুপায় ভালবাসার রাহুগ্রাস থেকে তার হয়তো মুক্তি নেই। কাউকে একটা বিয়ে করা যায় ঠিকই, কিন্তু সেটা হবে খুব সূক্ষ্ম এক তঞ্চকতা। নিজের সঙ্গে, বউটার সঙ্গেও। বড় হয়ে দেখা দেবে দেহ প্রয়োজন, সন্তান, সংসারের নিরাপত্তা। এই মাত্র। সুতরাং বীণার প্রতি তার কৃতজ্ঞতা থাকলেও কোনও ঋণ নেই। বীণাকে পছন্দ হলেও, প্রেম নেই। এ এক অদ্ভুত অবস্থা।

ঠাকুমাকে তামাক খেতে দেখে জ্ঞান বুঝে গেল, অঙ্কটা মিলবে না। একটা কালচারাল গ্যাপ দেখা দেবে।

তিন

একথা অত্যন্ত সত্য যে, ঝাড়গ্রামের কাছে যে গাঁয়ে বা গঞ্জে সে থাকে সেখানে সন্ধের পর আকাশের দিকে তাকালে নক্ষত্রগুলিকে অনেক কাছে বলে মনে হয়। টোপা টোপা বড় বড় তারা সব ঝুলে থাকে গাছের ফলের মতো। পড় পড় ভাব। সেখানে আকাশ অবশ্যই থ্রি ডাইমেনশন্যাল, কোন তারাটা কাছে, কোনটা পিছনে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সেই তুলনায় কলকাতার আকাশ অনেকটাই লেপাপোঁছা, মলিন। কলকাতার তারাগুলো ঝাড়গ্রামের তুলনায় কয়েক হাজার লাইট ইয়ার দূরে।

তবু ছাদে মাদুরে শুয়ে কলকাতার আকাশের মলিনতর তারাগুলির দিকে চেয়ে জ্ঞানের ভারী ভাল লাগল। ঘরের চেয়ে বাহির তার বরাবরই প্রিয়। তার রবীন্দ্রসংগীতের গলা বেশ ভাল। নির্জনতা পেলে এবং একা থাকলে সে কখনও কখনও গায়। ছাদে আজ কেউ নেই। সন্ধের পর আজকাল টি ভি-তে এত রং আর মশলাদার প্রোগ্রাম থাকে যে, কেউই ওই আঠা ছেড়ে ছাদেটাদে আসে না বড় একটা।

রবীন্দ্রনাথই যেন বলেছিলেন, একেলা গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দুই জনে। অতি সত্যি কথা। আসলে একা গানটান গাইতে থাকলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম পেয়ে যায়। দুজনে থাকলে এটা হয়তো হয় না। আর সেইজন্যই বোধহয় রবীন্দ্রনাথের ওই সতর্ক বার্তা।

ঘুমটা এমন আচমকা এল যে টুঁ শব্দটিও করতে পারল না জ্ঞান। ঠিক এভাবেই লোকে আততায়ীর চকিত ছুরিতে খুন হয়। ঘুমিয়ে পড়ার আগে শুধু তার মনে হয়েছিল, তারা ভরা আকাশটা নেমে আসছে তার ওপর। ঝাঁপিয়ে পড়ছে আশ্লেষে। এত তারার ছুরিকাঘাতই তাকে চৈতন্যের চৌকাঠ পার করে ঘুমের প্রকোষ্ঠে ঠেলে দিল।

ঝাড়গ্রামে কলেজের ছেলেরা তাকে মাঝে মাঝে জোর করে ফুটবল খেলতে নামায়। খারাপ লাগে না ব্যাপারটা। তবে আদিবাসী ছেলেদের পা লোহার ডাং-এর মতো শক্ত। লাগলে সমূহ চোটের সম্ভাবনা। তবে স্যারকে তারা বাঁচিয়েই খেলে। এমনকী খেলার পর প্রণামও করে যায়। আজও ঘুমের মধ্যে খেলছিল জ্ঞান! একটা অসুবিধে হল, স্বপ্নের মধ্যে কিছুতেই জোরে ছোটা যায় না। শত চেষ্টা করেও না। সে রাইট আউটের কাছে একটা বল পেয়ে গোলের দিকে এগোচ্ছিল, কিন্তু কিছুতেই কাছাকাছি যেতে পারছিল না। হাঁটু যেন ভেঙে আসছে, পা আটকে

যাচ্ছে। অথচ সামনে ফাঁকা গোলপোস্ট এবং গোলকিপার একা। ছুটতে পারছে না কেন জ্ঞান? কী হচ্ছে এসব? পিছন থেকে অপোনেন্ট দৌড়ে আসছে। পায়ের শব্দ পাচ্ছে জ্ঞান। তার আরও জোরে দৌড়োনো উচিত, সামনে ফাঁকা জমি, কিন্তু পারছে না... কিছুতেই পারছে না। আচমকাই পায়ের ডিমে পিছন থেকে কে যেন চার্জ করল। উঃ! জ্ঞান পা চেপে বসে পড়ল মাটিতে। একটুর জন্য গোলটা করতে পারল না সে। একটুর জন্য...

পায়ের ব্যথাতেই চোখ মেলে চাইল সে। এবং দুটো পেত্নিকে দেখতে পেল। দুদিকে খাপ পেতে বসা।

চিমটি কাটলি বুঝি?

না তো। পায়ে হাত বোলালাম একটু।

তবে পায়ের ডিমে ব্যথা করছে কেন?

আহা, তোমার যা কুম্ভকর্ণের ঘুম! সহজে ভাঙে নাকি?

একটা হাই তুলে জ্ঞান বলল, বাবা ফিরেছে?

দয়া বলল, না। একটু আগে আসানসোল থেকে ফোন করেছিল। খাদানে কী একটা জরুরি কাজ পড়ে গেছে। আজ আসবে না।

মা খেতে ডাকছে বুঝি?

না তো! এখনও রান্নাই হয়নি।

তা হলে ঘুমটা ভাঙালি কেন?

একটা প্রবলেম হয়েছে যে!

কীসের প্রবলেম?

রাত দশটা বেজে গেছে।

নিজের হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে জ্ঞান বলল, কোথায় দশটা। এখন তো ন'টা চল্লিশ!

দয়া বড় বড় চোখ করে জ্ঞানের দিকে চেয়ে বলে, ঘড়ির কাঁটা কি এক জায়গায় স্থির থাকে? আর কুড়ি মিনিট বাদে দশটা তো বাজবেই।

তাতে প্রবলেমটা কী হল? মতলব কী তোদের?

এপাশ থেকে বিদ্যা কুহু গলায় বলল, আচ্ছা দাদা, তুমি কি বেহালা বলে কোনও জায়গার নাম শুনেছ?

বেহালা! কলকাতার বেহালা?

হ্যাঁ!

শুনব না কেন? কী ইয়ার্কি হচ্ছে?

রাগ করছ কেন, সবটা আগে শোনোই না।

বলে ফেললেই তো হয়।

তুমি কি জান বেহালা কোথায় বা কেমন? কখনও গেছ বেহালায়?

বেহালায় যাওয়ার কোনও দরকার হয়নি, তাই জানি না।

তুমি কি জান বেহালা একটা অত্যন্ত কুখ্যাত জায়গা! সেখানে রোজ দিনেদুপুরে, বিকেলে এবং রাতে খুনখারাপি হয়।

বাজে বকিস না।

দয়া বলে, সত্যি গো দাদা! বেহালা হল এ প্লেস অফ রেড অ্যালার্ট, কলকাতার ম্যাপে বেহালাকে লাল কালি দিয়ে মার্ক করা আছে। তোলাবাজ, গুন্ডা, ছিনতাইবাজ গিজগিজ করছে সেখানে। অ্যাবডাকশন সেখানে রোজকার ঘটনা।

বিদ্যা বলল, তুমি কেন জান না তা জান? কারণ, তোমার গ্রামে খবরের কাগজ যায় না, টি ভি নেই, রেডিয়ো পর্যন্ত...

বাজে বকিস না। সেখানে রোজ খবরের কাগজ যায়, তবে একটু দেরি হয়! টি ভি-ও আছে, রেডিয়ো চলে।

তা হলে বলতেই হবে যে, তুমি খবরের কাগজ পড় না এবং টি ভি-ও দেখ না।

তোদের মতলব খারাপ। আমি নীচে চললাম।

দু পাশ থেকে বিদ্যা আর দয়া তার দুই হাত ধরে ফেলে বলে, আহা, একটু বোসোই না।

জ্বালালি।

আসলে বলছিলাম কী, খবরের কাগজে রোজ বেহালার খবর থাকে, কিশোরী অপহরণ, যুবক খুন, নেতা নিহত।

বুঝলাম। কিন্তু হঠাৎ তোদের বেহালায় পেল কেন? বেহালা খারাপ জায়গা হলেই বা আমাদের কী আসে যায়? আমরা তো বেহালায় থাকি না, থাকি লেক গার্ডেনসে।

ছিঃ দাদা, বেহালায় থাকি না বলেই কি বেহালায় যারা প্রাণ হাতে করে বাস করছে তাদের প্রতি আমাদের সিমপ্যাথি থাকবে না?

সন্দিহান চোখে দুই বোনের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে জ্ঞান বলে, বেহালায় কে থাকে?

অনেকেই থাকে, যাদের এই শহরে থাকার আর জায়গা জোটেনি তারাই থাকে। কোথায় যাবে বলো তারা? প্রাণ হাতে করেই যাতায়াত করতে হয়।

অত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ধানাইপানাই করছিস কেন?

যাতে জোরকা ঝটকা জারা ধীরে সে লাগে।

তার মানে কী?

অমিতাভ বচ্চনের বিজ্ঞাপনটা দেখনি?

না, ওসব দেখার আমার সময় হয় না।

দেখবেই বা কী করে বলো! সেখানে তো তোমার টি ভি নেই।

বিদ্যা সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, থাকলেই বা কী হত? সেখানে তো তিনদিন বাদে বাদে পাঁচ মিনিটের জন্য কারেন্ট আসে, তারপর ফের তিনদিন লোডশেডিং।

ওটা তো আফ্রিকার জঙ্গল নয়।

আমরা তো আর ঝাড়গ্রামের নিন্দে করতে চাইছি না। বরং আমরা বসে বসে প্ল্যান করছিলাম এবার শীতে তোমার গ্রামে আমরা পিকনিক করতে যাব।

গেলেই পারতিস।

আসলে তুমি তো কুঁড়েঘরে থাক, তোমার টয়লেটটাও নেই।

জ্ঞান হেসে ফেলল। বলল, এবার চুলের মুঠি ধরে দুজনের মাথা ঠুকে দেব। টিনের চালের ঘরকে কেউ কুঁড়েঘর বলে না। রীতিমতো পাকা বাড়ি। টয়লেটটা একটু দূরে—এই যা।

তারপর তোমার গ্যাস উনুন নেই, কয়লার উনুনে রাঁধতে হয়।

মোটেই না। কেরোসিন স্টোভ।

তার ওপর সেটা ব্যাচেলারস ডেন, চূড়ান্ত অব্যবস্থা। তাই আমাদের আগে থেকে প্ল্যান করতে হচ্ছে। আর প্ল্যান করতে গিয়েই রাত হয়ে গেল।

রাত হয়ে গেল মানে! রাত দশটাও তো বাজেনি।

দয়া ভালমানুষের মতো বলল, কলকাতায় রাত দশটা কিছু নয়, কিন্তু বেহালায় রাত দশটা মানে জান?

আবার বেহালা।

বেহালা নিয়েই তো প্রবলেম। বেহালায় রাত দশটায় নিশুতি।

বেহালা নিয়ে কীসের প্রবলেম তোদের?

বিদ্যা দাদার মাথা চুলকে দিতে দিতে বলল, আসলে আমাদের বন্ধু সতী বেহালায় থাকে।

তাতে কী হল?

সিনেমা দেখার পর বসে বসে পিকনিকের প্ল্যানিং করতে করতে ঘড়ির দিকে আমাদের একদম খেয়াল ছিল না। এখন বেহালার মতো

একটা ডেঞ্জারাস জায়গায় সতী একা কী করে ফিরবে বলো তো!

যেভাবে এসেছে সেভাবেই ফিরবে। রাত দশটায় কত মেয়েই তো ফেরে।

আজ সকালেই সতীদের পাড়ায় একটা ডেডবডি পাওয়া গেছে, জান? পাড়া থমথম করছে। পরশু একটা মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়ে গুন্ডারা মুক্তিপণ চেয়েছে।

আসল কথাটা কী?

আসল কথাটা হল বাঙালি ছেলেদের মধ্যে আজকাল আর কোনও অ্যাডভেঞ্চার নেই। তারা পাহাড়ে ওঠে না, সমুদ্রে যায় না, অলিম্পিকে দৌড়োয় না। তারা ভীষণ অলস আর কামচোর। যদিও তোমাকে আমরা তাদের ক্যাটাগোরিতে ফেলছি না।

বিদ্যা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, না না, আমাদের দাদা খুব ভাল। কেউ বিপদে পড়লে দাদা সবসময় তাকে হেলপ করতে চেষ্টা করে। মনে নেই গেলবার শান্তিনিকেতন থেকে গাড়ি করে বক্রেশ্বর যাওয়ার পথে কী হয়েছিল? একটা লোক বাসের ছাদে সুটকেস রেখে ভুল করে নেমে পড়েছিল। তারপর রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করছিল, কেউ আমাকে হেল্প করুন! প্লিজ দাদারা, আমাকে একটু হেলপ্ করুন, ওই বাসে আমার সুটকেসটা রয়ে গেছে! দাদা সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলে লোকটাকে তুলে নেয় এবং গিয়ে বাসের রাস্তা আটকে বাস থামায়! অচেনা লোককে গাড়িতে তুলতে মা-বাবা আপত্তি করেছিল। দাদা শোনেনি।

দয়া বলল, শুধু তাই? আসানসোলে থাকার সময় শীলা বউদির ভাই জয়েন্ট এনট্রান্সে চান্স না পেয়ে আত্মহত্যা করবে বলে চিঠি লিখে রেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল মনে আছে? সে কী কান্নাকাটি সবার! দাদাই তো পাড়ার ছেলেদের দলে দলে ভাগ করে সারা রাত খুঁজতে বেরিয়ে যায়। তারপর তেওয়ারিদের বাড়ির পিছনের বাগানের আমগাছতলা থেকে দাদাই তো তাকে দড়ি সমেত ধরে নিয়ে আসে।

নিজের কপাল চেপে ধরে জ্ঞান বলল, ওফ, এরা তো আমাকে পাগল করে দেবে দেখছি! কী চাস তোরা?

মাথা চুলকোনোর গতিটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে বিদ্যা বলল, লক্ষ্মী দাদা, বি শিভালরাস। সতীকে একটু বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসো। ও একাই যেতে চাইছিল, কিন্তু একা কি ছাড়া যায় বলো। অমন সুন্দরী একটা মেয়ে, বিপদ হতে কতক্ষণ? তা ছাড়া ও কলকাতায় নতুন এসেছে। এ

শহরের হালচাল এখনও জানে না।

হাঁফ ছেড়ে জ্ঞান বলল আরে দুর! এটা কোনও প্রবলেম হল নাকি? ওকে আজ রাতটা তোদের কাছে রেখে দে না, বাড়িতে একটা ফোন করে দিলেই তো হল!

দয়া করুণ গলায় বলল, তা হলে তো কথাই ছিল না। আসলে কী জান, ওদের পাড়ায় করপোরেশনের লোকেরা জলের লাইন সারাতে গিয়ে টেলিফোনের আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল কেটে ফেলেছে। পাড়ার সব ফোন ডেড।

জ্ঞান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে জানে তার এই বিচ্ছু বোনদুটি বড় সোজা পাত্রী নয়। ওরা যা চায় তাই হয়। আজ অবধি ওদের আবদার একটাও ফেলতে পারেনি জ্ঞান। বড় মায়া।

দুজনের কেউই লেখাপড়ায় তেমন ভাল ছিল না। মাঝারি নম্বর পেয়ে পাস করে ক্লাসে উঠত। বাবা প্রতিজ্ঞা করেছিল যতদিন ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করবে ততদিন বাড়িতে টি ভি ঢুকতে দেওয়া হবে না। দু বোনেই টি ভি-র জন্য একটু ঘ্যানঘ্যান শুরু করায় বাবা একদিন রাতে খাওয়ার টেবিলে ঘোষণা করল, দুজনেই যদি স্টার পেয়ে মাধ্যমিক পাস করে তা হলে ভাল রঙিন টি ভি কিনে দেওয়া হবে। শুনে দু বোনেই চুপচাপ উঠে গিয়েছিল। তারপর নিজেদের বোধহয় সামান্য একটু মোটিভেট করে নিয়েছিল ওরা। বাইরে একটা উদাস হালকা হাবভাব বজায় রেখে নিজেদের কীভাবে তৈরি করেছিল কে জানে। এ বছরই দুজন শতকরা আশির কাছাকাছি নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাস করল। তিনটে করে লেটার। তাই বোনদুটিকে একটু ভয়ও পায় জ্ঞান। তার আজকাল ধারণা হয়েছে ওরা কখনও ঠিকমতো ধরা দেয় না। কিছু লুকোনো আছে ওদের, বিশেষ কোনও জন্মগত ক্ষমতা। বাইরে থেকে যার হদিস পাওয়া অসম্ভব। সেইখানে ওরা একটু অ্যালিয়েন, একটু অচেনা, গ্রহান্তরের মানুষের মতো।

দয়া মিষ্টি করে বলল, ট্যাক্সিভাড়াটা সতীই দিয়ে দেবে বলেছে।

জ্ঞান বলল, থাক আর ভদ্রতা করতে হবে না।

বলেই উঠে পড়ল। দু বোন দুদিক থেকে ধরে তাকে এসকর্ট করে নেমে এল তিনতলায়।

আলোর দিকে মুখ করে মেয়েটা বসেছিল। তাকে দেখে মুখখানা নামিয়ে নিল লজ্জায়। মুখের ডৌলটি ভারী মিষ্টি। লজ্জার ভাবটিও ভারী সুন্দর।

ট্যাক্সিতে জড়সড় হয়ে বাঁদিকের দরজার সঙ্গে সেঁটে বসে আছে মেয়েটি। যথাসম্ভব ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে ডানদিকে চেপে বসে আছে জ্ঞান। মাঝখানে সিটটা অনেকটা ফাঁকা। শুধু সতীর হ্যান্ডব্যাগটা।

আপনাকে কষ্ট দিলাম।

আরে না। কষ্ট কীসের? তুমি বুঝি কলকাতার মেয়ে নও?

না। আমাদের বাড়ি বাঁকুড়ার সোনামুখীতে।

ও। সেখানেও তো কলেজ ছিল।

বাড়ি হলেও আমরা সোনামুখীতে থাকি না। বাবার স্টেট ব্যাঙ্কে বদলির চাকরি। তাই—

এখানে কে থাকে বেহালায়?

আমার ছোটমাসি।

বেহালায় বুঝি খুব গণ্ডগোল?

নাতো!

কী সব বলছিল যেন বিদ্যা আর দয়া। খুন, মেয়ে চুরি—

খুক করে একটু হাসল সতী, আমরা থাকি রায়বাহাদুর রোডে। সেখানে কোনও গণ্ডগোল নেই।

ও। বলে চুপ করে গেল জ্ঞান।

আমার খুব লজ্জা করছে।

কেন?

আপনার আজ দেরি হয়ে গেল।

কালপরশু আমার ছুটি। বাড়ি এলে এমনিতেই গল্পটল্প করতে করতে রাত হয়েই যায়। তোমার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। আমি কিন্তু বেহালার রাস্তা ভাল চিনি না। তুমি ড্রাইভারকে ডিরেকশন দিলে ভাল হয়।

সতী ঘাড় নেড়ে বলল, ঝাড়গ্রাম খুব সুন্দর জায়গা, না!

আমি কিন্তু ঝাড়গ্রামে থাকি না। শহর থেকে দূরে একটা গাঁয়ে থাকি।

জানি। আমার তো গ্রামই ভাল লাগে। কলকাতা আমার একটুও ভাল লাগে না। হাঁফ ধরে যায়। কলেজে আমাদের একটা আলাদা গ্রুপ আছে।

কীরকম?

আমরা যারা কলকাতার বাইরের মেয়ে তাদের একটা গ্রুপ। তাতে আমি আছি, বিদ্যা আর দয়া আছে, আরও কয়েকজন।

তোমাদের কলকাতার মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া হয় না তো!

সতী হেসে ফেলল, না না। ঝগড়া হয় না। কখনও সখনও নকল

ঝগড়া করি। তারপর ভাব হয়ে যায়। কিছুদিন পর আমরাও তো কলকাতার মেয়ে হয়ে যাব।

কলকাতাও তার মতো করে সুন্দর। শহরটার ভিতরে যেন আরও অনেক শহর, অনেক সভ্যতা লুকিয়ে আছে। একে আমার একটা শহর বলে কিছুতেই মনে হয় না।

ভারী করুণ গলায় সতী তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, কলকাতা শহর যে আমি এখনও ভাল করে চিনিই না!

সহজে চেনা যায়ও না। দেখবে অনেক লোক আছে যারা দীর্ঘদিন কলকাতায় বাস করেও কলকাতাকে চিনতে পারে না, কলকাতার মানুষও কখনও হয় না তারা, যেন বিদেশে আছে।

কেন এরকম হয়?

কলকাতাকে যে ভাল না বাসে কলকাতা তার কাছে ধরা দেয় না যে।

একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে সতী। অনেকক্ষণ বাদে একটু চাপা গলায় বলল, সত্যি?

আমার তাই মনে হয়।

যারা কলকাতাকে ভালবাসে তারা কলকাতার মধ্যে কী দেখতে পায়?

তারা দেখতে পায় কলকাতা কত সুন্দর। জীবনানন্দ দাশের নাম শুনেছ?

সতী হেসে ফেলল।

হাসলে যে!

আমি তো জীবনানন্দ-পাগল। মন খারাপ হলেই পড়ি।

তা হলে তো জান। জান না?

বলুন না!

জীবনানন্দ এই কলকাতাকে সকালে, দুপুরে, রাতে, গভীর রাতে খুঁজে বেড়াতেন। চেনা অচেনা পথে হাঁটতেন উদ্দেশ্যবিহীন। কলকাতার কত রূপ ওঁর কবিতায়। কলকাতার একমাত্র বাউল।

আবছা অন্ধকারে মুখ ফিরিয়ে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে সতী। আর মৃদু একটা গন্ধ ভেসে আসছে ওদিক থেকে। না, কোনও কৃত্রিম সুগন্ধ নয়। অন্যরকম এক গন্ধ। কিংবা ঠিক গন্ধও নয়। একটা বার্তা। একটা হয়তো মেসেজ। মৃদু, অস্ফুট, খুব ভীরু কোনও মেসেজ? ভুলও হতে পারে।

রাস্তার কথাটা ভুলে যাওনি তো!

না। রায়বাহাদুর রোড সব ট্যাক্সিওলাই চেনে যে!

ও।

আপনি বলুন না।

কী বলব?

কী সুন্দর বলছিলেন! এত ভাল লাগছিল শুনতে!

আমি কিন্তু ভাল কথা কইতে পারি না।

ভাল কথা মানে কি সাজিয়ে বলা কথা?

অনেকে কী সুন্দর কথা কয়! শুনতে ইচ্ছে করে। আমার কথাই আসতে চায় না। ভাগ্য ভাল যে, আমার বিষয় হল অঙ্ক। চক আর ব্ল্যাক বোর্ড, খাতা আর ডট পেন হলেই হয়। ক্লাসেও আমার কোনও ভাষণ নেই।

সতী তেমনই চেয়ে আছে। হঠাৎ খুব মৃদু স্বরে বলল, অন্যরকম হবেন কেন?

একটু চুপ করে থেকে কথাটা বুঝবার চেষ্টা করল জ্ঞান। সব কথা হয়তো ঠিক বোঝাও যায় না। সংকেতের মতো। ছুঁয়ে যায় মাত্র। একটা শিহরন রেখে যায়।

যেদিন তুমি আমার কাছে অঙ্ক শিখতে এসেছিলে সেদিন বোধহয় তোমাকে আমি একটু বকেছিলাম। তাই না?

না তো! আপনি শুধু বলেছিলেন, তুমি অঙ্কে ভীষণ কাঁচা।

তুমি রাগ করনি?

রাগ! না। বুকের মধ্যে খুব গুড়গুড় করে উঠেছিল, মনে আছে।

ইতিহাসের ছাত্রী হয়ে তুমি অঙ্ক শিখতে চেয়েছিলে কেন?

বলব? রাগ করবেন না?

না, রাগ করার কী আছে? আমার কখনও রাগ হয় না।

আপনাকে দেখে আমার একটু কথা বলতে ইচ্ছে হয়েছিল। অঙ্কটা ছিল অজুহাত।

সেই শিহরনটা আর একবার! কথা ছুঁয়ে যাচ্ছে তাকে। মৃদু সংকেত। রূপটানের নয়, একটা মেয়ের অস্তিত্বের মেয়েলি সুঘ্রাণ পায় কি সে?

তোমার বাড়ি এসে গেল বুঝি?

হ্যাঁ, এই তো! আপনি নামুন।

আমি! এখন দশটা কুড়ি যে! রাত হয়ে যাবে—

কথাটা শুনলই না সতী। পিছু ফিরে দরজার দিকে যেতে যেতে শুধু বলে গেল, কফি করছি।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে সসংকোচে নামল জ্ঞান।

বেশ সাজানোগোছানো এক বৈঠকখানায় অল্পবয়সি কৌতূহলী এক হাস্যময়ী মাসির সামনে বসে জ্ঞান কফি খেতে খেতে সামান্য একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। এভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকা মাসির বোধহয় উচিত হচ্ছে না।

আচ্ছা, আপনি বলব না তুমি বলব সেটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। আসলে এত অল্প বয়স, তুমিই বলি, কেমন?

হ্যাঁ হ্যাঁ। স্বচ্ছন্দে।

আমি ভেবেছিলাম তোমার বোধহয় আর একটু বয়স হবে। এখন তো দেখছি একদম ছেলেমানুষ!

কথাটা জ্ঞান মোটেই বুঝতে পারল না। তার সম্পর্কে মাসির কোনও পূর্বানুমান করার কারণ কী হতে পারে! সে তো এদের চেনাজানা কেউ নয়। শুধুমাত্র মাসির বোনঝিকে পৌঁছে দিতে আসা। নিতান্তই আকস্মিক প্রয়োজনে। তবে মাসি তাকে নিয়ে ভেবে রেখেছিল কেন? ভারী বুরবক লাগছে নিজেকে জ্ঞানের।

হাসিখুশি মাসি বলল, তোমরা তিনজনেই ভারী সুন্দর।

জ্ঞান অবাক হয়ে বলে, কারা?

বিদ্যা, দয়া আর তুমি। ওদের চেহারায় শার্পনেস বেশি। তুমি বড্ড ভালমানুষ।

ওরা আসে বুঝি এ বাড়িতে?

ও মা! আসে না আবার! তিনজনে যা হুটোপাটি হুল্লোড় করে যে কান ঝালাপালা। ওরা এলে বাড়িটা যেন ভরে রাখে। আমার তো ছেলেপুলে নেই, তাই...

এই করুণরসাত্মক কথাটা মাসি শেষ করলেন না। করার দরকারও ছিল না। সব বাক্য নিঃশেষে বলার দরকার হয় না। যেটা সে বুঝতে পারছে না সেটা হল, তার সম্পর্কে মাসির পূর্বানুমান। কেন এই পূর্বানুমান?

কফি শেষ করে সে উঠল, আজ আসি।

এসো। আজ আটকাব না, রাত হয়ে যাচ্ছে, মা নিশ্চয়ই ভাবছে। আর একদিন সময় নিয়ে আসবে কিন্তু।

ফেরার সময় ট্যাক্সিতে মাথাটা কেমন ভোম্বল হয়ে রইল জ্ঞানের। লেক গার্ডেনসের ভুলভুলাইয়াতে সে বারদুয়েক টার্ন ভুলে অন্য রাস্তায় নিয়ে গেল ট্যাক্সি। বাড়ি ফিরল রাত এগারোটার একটু পরে।

তাকে দেখেই দুই বোন লাফিয়ে উঠে গাজি গাজি করে এসে ধরল।

দয়া চেঁচাল, এই দেখো মা, এই দেখো, কোথাও গুলি বা বোমা লাগেনি, নো স্ট্যাবিং উন্ড, হাত-পা সব আস্ত আছে, অল ইন ওয়ান পিস। এমনকী মুখটায় একটু হাসি হাসি ভাবও।

বিদ্যা একটু চাপা গলায় দয়াকে বলল, ইভন, দেয়ার ইজ নট এনি স্ম্যাক অফ লিপস্টিক অন হিজ লিপস! হি ইজ কমপ্লিটলি আনস্কেদ্‌ড।

কানদুটো একটু গরম হয়ে উঠল জ্ঞানের। মায়ের দিকে চেয়ে বলল, খুব ভাবছিলে নাকি?

নবলা উল বুনতে বুনতে বিরক্ত মুখে বলল, ভাবছি কি সাধে? ওরাই তো বলছিল বেহালা নাকি সাঙ্ঘাতিক জায়গা। রাস্তার এধারে ওধারে গুলি চালাচালি হচ্ছে সবসময়, পেছন থেকে নাকি গুন্ডারা ছোরা বসিয়ে দিয়ে যায়, দুমদাম বোমা মারে। আমরা কলকাতায় নতুন, এ শহরের ঘাঁতঘোঁত কি অত বুঝি? মেয়েটারই বা রাত করার কী দরকার ছিল?

ওদের কথা সিরিয়াসলি নাও কেন? দুটোই যে হাড়ে হাড়ে বজ্জাত তা জান না?

বিদ্যা চেঁচিয়ে উঠল, বললে দাদা! বললে!

দয়া করুণ গলায় বলল, বলতে পারলে?

একজন ছাত্র তার মোটরবাইকে জ্ঞানকে ঝাড়গ্রাম স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিল। সেখান থেকে টাটা-খড়্গপুর লোকালে খড়্গপুর। ফের খড়্গপুরে ভিড়াক্রান্ত মেদিনীপুর-হাওড়া লোকালে গরমে ঘামে ভিড়ে চিড়েচ্যাপটা হয়ে হাওড়া স্টেশন। বাস ধরে বাড়ি। শরীর যথেষ্ট ক্লান্ত ছিল। কিন্তু রাতে বিছানায় শুয়েই সে বুঝতে পারছিল, ঘুম আসবে না সহজে। মাথাটা গরম।

চার

ঘুম যে সবসময় হিরণ্ময় তা তো নয়। আজ রাতের অনিদ্রাকে জ্ঞান উপভোগই করছে। সন্ধের টেলিফোন ঝাঁপি থেকে অনেক সাপ বের করে এনেছে আজ। তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখন তাদেরই সঞ্চার বুঝি।

নিজের এই একান্ত ঘরে, মনোরম অন্ধকারে কত দূর পর্যন্ত নিজেকে দেখতে পাচ্ছে সে! অপমানিত, প্রত্যাখ্যাত, লাঞ্ছিত জ্ঞানের তখন কাণ্ডজ্ঞান নেই। খায় না, ঘুমোয় না, দাড়ি কামায় না, পাগলের মতো ঘুরে বেড়ায় কলকাতার পথে-বিপথে। বহুবার গিয়ে বন্যাদের পাড়ায় চোরের মতো হানা দিত সে। ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে থাকত ওদের ফ্ল্যাটের জানালার দিকে। তার মনে হত, কিছু একটা হবে। কোনও আশ্চর্য ঘটনায় ভেস্তে যাবে বন্যার বিয়ে। তারপর ঠিক বন্যা ফিরে আসবে তার কাছে।

সে কোনওদিন মারকুট্টা, আক্রমণাত্মক মানুষ নয়। কিন্তু তখন তার মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে হত অলক নামক বন্যার সেই প্রেমিকটিকে একদিন আক্রমণ করে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। জেল হোক, ফাঁসি হোক, কিছু যায় আসে না তার। হাত-পা নিশপিশ করত তার। আর অক্ষম সেই রাগ তার ভিতরটাকে কুরে কুরে খেয়ে শারীরিকভাবে তাকে দুর্বল করে ফেলছিল। সবচেয়ে অবাক লাগছিল, যে মেয়েটার শরীরের গন্ধ তার শরীরে লেগে আছে আজও, যার শ্বাসবায়ুর সঙ্গে মিশেছে তার শ্বাস, ঠোঁটে ঠোঁট, শরীরে শরীরে বে-আব্রু উন্মাদ ভালবাসা হল যার সঙ্গে, সে হঠাৎ এক রাজকন্যার মতো, পরির মতো, স্বপ্নের মতো দূরের হয়ে গেল কেমন করে? যত ভেবেছে তত পাগল হয়েছে সে।

ডাকে রোজ চিঠি দিত সে বন্যাকে। রোজ। কখনও কখনও দুটি-তিনটি। কোনও জবাব আসেনি কখনও। একবার ঠিক করেছিল গিয়ে অলকের পায়ে ধরে বলবে, বন্যাকে ছেড়ে দিন, আমি আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।

ওষুধের দোকানে গিয়ে স্লিপিং পিল কেনার চেষ্টা কম করেনি সে। ট্রেনের তলায় ঝাঁপ দেবে না কী করবে তাও স্থির করে উঠতে পারেনি। ক্ষীণ আশা ছিল, বন্যা হয়তো তার সঙ্গে একটা রহস্য করছে মাত্র। আসলে সে জ্ঞানকেই ভালবাসে, ও ছেলেটা সাজানো একজন। বন্যা হয়তো একদিন ভোরের মতো তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলবে, তুমি আমাকে কতটা ভালবাস তাই পরখ করছিলাম গো! আমি কি তোমাকে

ছাড়া আর কাউকে বরণ করতে পারি! তোমাকে কি আমার সব দিইনি? কী বাকি রেখেছি বলো!

কল্পিত কত সংলাপ হত মনের মধ্যে! ওই ক্ষীণ অসম্ভব আশা তাকে তখনও বাঁচিয়ে রাখছিল একদিন-দুদিন করে। ঘুম হত না তখন। মাঝে মাঝে একটু-আধটু তন্দ্রা হঠাৎ চমকে ভেঙে যেত। বুকের ভিতর ধক ধক করত হৃৎপিণ্ড, এসব দুঃস্বপ্ন নয় তো! এরকম কি হতে পারে?

জ্ঞানবয়সে কখনও কাঁদেনি জ্ঞান। তখন কাঁদত। একা হলেই কান্না পেত তার, অঝোরে কাঁদত।

সেইসময়ই একদিন হঠাৎ আসানসোল থেকে খবর এল, তার বাবা খনি শ্রমিকদের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে হাসপাতালে। অবস্থা ভীষণ খারাপ।

দুর্বল মন, ততোধিক দুর্বল শরীরে সেই খবর পেয়ে সে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। তারপর পাগলের মতো ছুটল আসানসোলে।

শ্রমিকদের হাতে মার খাওয়ার কথা নয় তার বাবার। কয়লাখনির সেফটি ম্যানেজার মনসিজ চক্রবর্তী চিরকাল পলিটিক্স আর শ্রমিক আন্দোলন করেছে। ছেলেবেলা থেকেই জ্ঞান দেখে আসছে তাদের বাড়িতে নেতারা এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে মিটিং বসায়। তার মাকে হাঁড়ি হাঁড়ি চা করতে হয়। মনসিজ চক্রবর্তীর ধ্যানজ্ঞান ছিল পলিটিক্স। মা এই নিয়ে মাঝে মাঝে অশান্তি করলে মনসিজ বলত, যার জীবনে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বা পটভূমি নেই সে মানুষের জীবনই যাপন করছে না। যে রাজনীতি করে না সে সামাজিক মানুষই নয়। তারা আত্মসর্বস্ব, বোধহীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন আগাছা মাত্র। তাদের গুরুত্ব পোকামাকড়ের চেয়ে বেশি নয়।

সেই মনসিজ শ্রমিকদের হাতেই মার খায় কী করে? বাবা মরে গেলে কী হবে তাদের?

মনসিজের মরে যাওয়ারই কথা। বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্যের।

ঘটনার দিন দুর্গাপুরে পার্টির এক বড় নেতা এসেছিল মিটিং করতে। অন ডিউটি মনসিজ সেই মিটিং-এ গিয়েছিল বোধহয় রাজনীতির উপরের ধাপে পা রাখার পথ প্রশস্ত করার জন্যই। কারণ মাঝে মাঝে তখন বৃহত্তর ক্ষেত্রে রাজনীতি করার কথা মনসিজের মুখে শোনা যেত।

মিটিং থেকে ফিরতে দেরি হয়। ওদিকে দু নম্বর পিটে দুপুরবেলা ধস নেমে জনা সাতেক শ্রমিক আটকে পড়ে।

এদেশের খনিশ্রমিকদের নিরাপত্তা বরাবরই পলকা। অত্যাধুনিক

সরঞ্জাম নেই, মান্ধাতার আমলের জিনিস দিয়ে কাজ চলে। শ্রমিকদের প্রাণ হাতে করেই কাজ করতে হয়।

সেই সাতজন শ্রমিককেও উদ্ধার করা যায়নি। বিশাল ধস। সেই ধস চটজলদি সরানো সম্ভব ছিল না। আর সেই জরুরি সময় অন ডিউটি সেফটি ম্যানেজার ছিল নিপাত্তা।

শ্রমিকরা খেপে গেল। জুটল এসে গুন্ডা, মস্তান, নিষ্কর্মা লোক। এল মনসিজের রাজনৈতিক বিরোধীরাও। পরিস্থিতির সদ্‌ব্যবহার না করে কোন আহাম্মক? ক্ষিপ্ত শ্রমিকরা ইন্ধন পেয়ে ক্ষিপ্ততর, খুনিয়া হয়ে উঠছিল ক্রমে।

বেশ একটু বেশি রাতের দিকে যখন মনসিজ তার দু-একজন সঙ্গীকে নিয়ে ফিরছিল তখনই লাঠি, রড, টাঙ্গি ইত্যাদি নিয়ে তার ওপর চড়াও হয়েছিল তারা।

না, মনসিজের সেদিন বাঁচার কোনও কথাই ছিল না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে থানার ওসি তপন সান্যাল ছিল সম্পর্কে মনসিজের লতায়পাতায় আত্মীয়। তবে তপন তাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে এসে চা খেয়ে গল্পটল্প করে যেত। এরকম হামলা হতে পারে ভেবে তপন সান্যাল তৈরিই ছিল। শুধু শ্রমিকরা অনেকগুলো গ্রুপে ভাগ হয়ে নানা জায়গায় অপেক্ষা করছিল বলে ঠিক কোন স্পটে অ্যাটাকটা হবে তা বুঝতে সময় লাগে। একটা লোককে মারতে তো বেশি সময় লাগে না। রড আর লাঠি আর টাঙ্গির ঘায়ে বিস্মিত বিহ্বল মনসিজ যখন নিজের রক্ত মাংসে একাকার হচ্ছে সেইসময় পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে এবং হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ডাক্তাররা কোনও আশ্বাস দিতে পারেনি মনসিজের অবস্থা দেখে। মাল্টিপল্ ইনজুরি। তার মধ্যে পেটে আর মাথায় ক্ষত গভীর ও মারাত্মক। রডের ঘায়ে বাঁ হাঁটু ভেঙে গিয়েছিল। দুটো হাতও।

জ্ঞান যখন গিয়ে পৌঁছোয় তখন মনসিজ গভীর অচৈতন্যে ডুবে আছে। অক্সিজেন, রক্ত, ড্রিপ সবই চলছে। প্রতিদিন অবস্থা খারাপ হয়, আবার সামান্য উন্নতি হয়। বাড়িতে এমন লাগাতার কান্নাকাটি হয় যে জ্ঞান সহ্য করতে পারে না। বাড়িতে রান্নাবান্না বন্ধ। পাশের বাড়ি থেকে দয়ালু এক মাসিমা তাদের ডেকে খাইয়ে দেন। খিদের মুখেও জ্ঞানের তখন খাবার রুচত না।

হাসপাতালই তখন তাদের ঘরবাড়ি। ভিতরে সবসময় ঢোকা যেত না বলে জ্ঞান বারান্দা বা সিঁড়ি, কোথাও বসে থাকত। অনেক সময় সারা

রাত। পার্টির লোক, সহকর্মীরা বা চেনাজানা কেউ সমবেদনা জানাতে এলে বিরক্ত হত জ্ঞান। মরছে তো তার বাবা, এদের তাতে কী আসে-যায়? কাউকেই তখন তাদের বন্ধু বলে মনে হত না তার। বাবাকে এত মারল ওরা, আর ওদের জন্যই না বাবা সারাজীবন এত লড়াই করেছে।

জীবনের সেই উঠতি বয়সের দুটি ঘটনায় যেন জ্ঞান খুব তাড়াতাড়ি প্রবীণ হয়ে যেতে বসেছিল।

তখন ঘটনার আকস্মিকতা আর বীভৎসতায় সময়ের কোনও ধারণাই ছিল না জ্ঞানের। কাজেই তার বাবার জ্ঞান ঠিক কদিন পরে ফিরেছিল তা সে বলতে পারবে না। বোধহয় চার-পাঁচ দিন। সেটা ঠিক জ্ঞান ফেরা নয়। গভীর আচ্ছন্নতার মধ্যে ডাকলে রক্তাভ চোখ মেলে একটু তাকাত। ফের তলিয়ে যেত ঘুমে। ডাক্তারদের কাছে তখন ওটাই অনেক।

দিন দশেক বাদে ডাক্তাররা জানাল, এযাত্রা বেঁচে যাবে, যদি ক্ষতস্থানগুলি বিষিয়ে না ওঠে বা ব্রেন ড্যামেজ তেমন গুরুতর না হয়ে থাকে।

খুব ধীরে ধীরে মনসিজ ফিরে আসছিল জীবনের মধ্যে। বেঁচে থাকাদের মধ্যে। দিন কুড়ি-পঁচিশ বাদে অ্যাম্বুলেন্সে করে মনসিজকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মাথার সিটি স্ক্যান করাতে। রিপোর্টে খারাপ কিছু ছিল না।

একদিন হাসপাতাল থেকে মনসিজকে বাড়িতে ফিরিয়েও আনা হল। বাবার শয্যাপার্শ্বে নিঝুম হয়ে বসে থাকত জ্ঞান। সে পরিষ্কার বুঝতে পারত যে বাবাকে সে ছেলেবেলা থেকে চেনে এ সে নয়। একদম সে নয়। মনসিজের স্মৃতিভ্রংশ হয়নি, মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেনি, নিজের ভাঙাচোরা শরীরের জন্য হা-হুতাশও সে করত না কিন্তু। শুধু চুপ করে চেয়ে থাকত। সেই চোখে গভীর হতাশা আর শূন্যতা। সে এমন এক বিপুল স্বপ্নভঙ্গ, এত ব্যাপক হৃদয়-মন্থন-করা মানসিক বজ্রাঘাত যে মনসিজের মুখে কথা ফুটত না। কিছু জিজ্ঞেস করলে, কয়েকবার প্রশ্নের পর একটা-দুটো কথায় দায়সারা জবাব দিত মাত্র। পুলিশের কাছে জবানবন্দিতেও মনসিজ প্রায় কিছুই বলতে পারেনি বা বলার মতো প্রবৃত্তি বা ইচ্ছে হয়নি তার। সমস্ত জীবন, কর্মক্ষেত্র, পরিবার, প্রিয়জন সবই যেন ভীষণ মিথ্যে হয়ে গিয়েছিল তার কাছে। আর সেই প্রবল বিরাগের ছাইমাখা মুখখানার দিকে চেয়ে জ্ঞান একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা

পেতে শুরু করে। তার নিজের উন্মাদ বিরহ যেন তার বাবার ওই হতাশার মধ্যেই একটা আশ্রয় খুঁজে পেল। এই তো তার মতোই একজন, কিংবা তার চেয়েও বেশি বজ্রাহত আর একজন যার জীবনের স্থণ্ডিলটাই যেন সরে গেছে।

মাস দুই বাদে মনসিজ একদিন খোঁড়াতে খোঁড়াতে ক্রাচে ভর দিয়ে কোনওক্রমে তার কাজেও যোগ দিতে গেল। কিন্তু কেমন যেন বাক্যহারা, ভ্যাবাচ্যাকা, মস্তিষ্কহীনতায় আক্রান্ত এক মানুষ।

পার্টির সহকর্মীরা সান্ত্বনা দিত, আরে, এত ভেঙে পড়ছেন কেন? এরকম তো হতেই পারে। জাস্ট একটা অ্যাকসিডেন্ট ছাড়া আর কী?

মনসিজ খুব সন্তর্পণে দীর্ঘশ্বাস ফেলত মাত্র। তর্ক করত না।

চাকরির ক্ষেত্রেও কিছু অসুবিধে দেখা দিয়েছিল। অন ডিউটি অ্যাবসেন্ট থাকার জন্য চার্জশিট এবং সাসপেনশন। তবে কর্তৃপক্ষ তার ওপর ওরকম হামলা হওয়ায় খুব কড়া শাস্তি দিল না। শুধু দায়িত্বের কাজ থেকে সরিয়ে জেনারেল ডিউটিতে লাগিয়ে দিল। সেটা কেরানিগিরিরই পর্যায়ে পড়ে। সেইসঙ্গে প্রোমোশনের সম্ভাবনাও আটকে দেওয়া হয়েছিল।

রাজনীতি নিয়ে মনসিজের মুখে আর কোনও কথাই শোনা যেত না। বাইরের আঘাতের চেয়েও তার ভিতরের আঘাত ছিল গভীরতর।

বাবার ওই বিপুল হতাশা আর শূন্যতাই জ্ঞানকে শান্ত করেছিল। মাথা ঠান্ডা হল। জীবনে সত্যকে মেনে নিতে তৈরি হতে লাগল সে। এম এস-সিতেও ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে গেল সে। তার জোরে আসানসোলের কাছেই একটা স্কুলে মাস্টারিও জুটল তার।

হঠাৎ একদিন খাওয়ার টেবিলে মনসিজ খুব মৃদুস্বরে নবলাকে বলল, কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট কেনা যায় না?

নবলা অবাক হয়ে বলল, কলকাতায়? তুমি যে আসানসোলে জমি কিনে রেখেছ বাড়ি করবে বলে?

মাথা নেড়ে মনসিজ বলল, না, এখানে আর নয়।

নবলা ভারী উজ্জ্বল মুখে বলল, আমারও কতকালের ইচ্ছে কলকাতায় গিয়ে থাকি। ফ্ল্যাট কিনলে তো ভালই হয়। সত্যি বলছ তো!

হ্যাঁ।

কিন্তু তোমার চাকরি?

আমার আর ভাল লাগছে না। কিছু ভাল লাগছে না।

কিন্তু আমরা খাব কী? চলবে কীসে? জ্ঞানের নতুন চাকরি।

অনেকক্ষণ থম ধরে রইল মনসিজ। তারপর বলল, আপাতত তোমরা কলকাতায় চলে যাও। চাকরি যতদিন করতে হবে ততদিন আমি এখানে থাকব।

তোমাকে দেখবে কে?

জ্ঞান তো আছে।

ফ্ল্যাট কিনতে তাদের অসুবিধে হয়নি। আসানসোলে অনেকদিন আগে প্রাইম জায়গায় মনসিজ বারো কাঠা জমি কিনে রেখেছিল। সেই জমিটা খুব ভাল দামে বিক্রি হয়ে গেল। সেই টাকায় লেক গার্ডেনসের ফ্ল্যাট কিনেও বাড়তি অনেক টাকা রয়ে গেল তাদের। দয়া আর বিদ্যার মাধ্যমিক পরীক্ষা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল তারা। তার পরেই গোটা পরিবার উঠে এল। ফ্ল্যাটটা কেনার পর প্রথম মনসিজের মুখে একটু হাসি দেখতে পেল সবাই। বছরখানেক আগেকার কথা।

একজন মানুষ নেতা হোক, সাধু হোক, ইঞ্জিনিয়ার হোক, মন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি যাই হোক তার ভিতরে একজন ব্যক্তিগত মানুষ থাকবেই। সেই ব্যক্তিগত মানুষটাকে তার বাইরের পরিচয় দিয়ে চেনা যায় না। ধরাও যায় না। মাঝেমধ্যে নানা অভিঘাতে মানুষ বাইরের নাম-পরিচয়-প্রতিষ্ঠা বা ইমেজ থেকে গুটিয়ে গিয়ে ওই ব্যক্তি মানুষের ছোট্ট গণ্ডিতে ফিরে আসে। গুটিপোকার মতো সেইখানেই আটকে যায়। বাইরের দুনিয়া, বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র এসবের কোনও মানে থাকে না তার কাছে।

মনসিজের কি এখন সেই অবস্থা?

যে কয়েক মাস আসানসোলের কলিয়ারিতে সে তার বাবার সঙ্গে একা বাস করেছিল সে সময় দেখেছে জ্ঞান, মনসিজ পার্টির মেম্বারশিপ রিনিউ করে, মিটিংটিটিং-এও যায়, কিন্তু কোনও মতামত প্রকাশ করে না। বক্তৃতা দেওয়া ছেড়ে দিয়েছে। বরং মাঝে মাঝে কয়েকজন বন্ধু জুটিয়ে ব্রিজ খেলে সময় কাটায়। আর শুক্রবার কবে আসবে তার জন্য আঁকুপাঁকু করে। শুক্রবার এলেই ছোটে কলকাতায়। বাবার এই অদ্ভুত পরিবর্তন দেখে হেসেছে জ্ঞান। এ বাবাকে সে চেনে না।

মাস দশেক আগে জ্ঞান ঝাড়গ্রামে চাকরি পেয়ে যখন চলে আসে তখন মনসিজের চোখ ছলছল করেছিল যা এক পরাবাস্তব বলে মনে হয়েছে জ্ঞানের। পরিবারের প্রতি এরকম দুর্বল হতে মনসিজকে কখনও দেখেনি জ্ঞান।

মনসিজ তাকে বলেছিল, সাবধানে থেকো। এখন আমার তো

তোমরাই আছ। আর কিছু নেই।

তুমি একা কী করে থাকবে?

আজকাল একা থাকতে কষ্ট হয়। তবে আর তো কয়েকটা বছর। কষ্ট হবে, তবু চালিয়ে নেব।

মনসিজের এই পরিবর্তন, এই ভাঙচুর কি ট্র্যাজিক ঘটনা? নাকি এর মধ্যেই নিহিত আছে মঙ্গল। কে এ প্রশ্নের জবাব দেবে?

তবে তার নিজের জীবনের এক বিপর্যয়ের সময় তার বাবার জীবনের বিপর্যয় তাকে যে সাহচর্য দিয়েছিল তা সে ভুলতে পারে না। বাবার জন্যই বেঁচে গেল সে।

ঘুমের পদসঞ্চার যখন শরীরে টের পেল জ্ঞান, মধ্যরাতে, মনে হল, আজ কি বন্যাকে স্বপ্ন দেখব? আজ যেন বন্যাকেই স্বপ্নে দেখি।

ছেলেবেলা থেকে বহুবার খাদানে নেমেছে জ্ঞান। তার প্রিয় জায়গা ছিল নিকষ কালো অন্ধকার খনিগহ্বর। মাথায় লোহার টুপি পরিয়ে দিত বাবা, হাতে ভারী টর্চ দিয়ে চেনা শ্রমিকদের সঙ্গে তুলে দিত লিফটের খাঁচায়। নীচে ভ্যাপসা, অন্ধকার, রহস্যময় জগতে নামতে নামতে রোমাঞ্চ হত তার। খাদানের অলিতে গলিতে, নানা রন্ধ্রে ছুটে বেড়াত সে। গরমে ঘেমে যেত, তেষ্টা পেত। একসময় বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে চুপ করে উবু হয়ে বসে থাকত এক জায়গায়। চারদিকে যে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার তেমনটা আর কোথাও দেখা যায় না। সেই অন্ধকার যেন এক কঠিন বস্তু, তার কোথাও কোনও ফাটল নেই, রন্ধ্র নেই। খনির সুড়ঙ্গ ছাড়া কোথাও অমন অন্ধকার দেখা যায় না। জ্ঞান চুপ করে বসে সেই চক্ষুহীন অন্ধকারকে উপভোগ করত। মনে হত, আমি নেই, তুমি নেই, কেউ নেই, কিছু নেই।

আজ স্বপ্নে সেই খাদানের মধ্যে টুপ করে খসে পড়েছে জ্ঞান। চুপ করে বসে আছে রন্ধ্রহীন, নিপাট, নিকষ অন্ধকারে।

অদূরে কোথাও, অন্ধকারে একটামাত্র গাঁইতির শব্দ হচ্ছে। খুব ক্ষীণ শব্দ। অনেকক্ষণ বাদে বাদে কে যেন দুর্বল হাতে একটা গাঁইতি তুলে খচ করে বসিয়ে দিচ্ছে কয়লার দেওয়ালে। পারছে না। তার হাঁফ ধরা শ্বাসবায়ুর শব্দ শুনতে পাচ্ছে জ্ঞান। খুক খুক করে কাশছে লোকটা।

জ্ঞান চিৎকার করে বলল, শুনতে পাচ্ছ! আমি খোকাবাবু। তুমি কে?

একজন বুড়ো মানুষের ঘড়ঘড়ে গলা বলল, আমি? আমি একজন মজুর।

তোমার বাতি নেই?

বাতি? বাতি কবে নিবে গেছে।

তুমি যে হাঁফিয়ে গেছ! পারছ না!

পারছি। না পারলে এত বড় সুড়ঙ্গটা খুঁড়লুম কী করে?

একা?

একা।

পারবে?

পারতেই হবে।

কতদিন লাগবে তোমার?

হাজার বছর। হয়তো হাজার হাজার বছর।

আমি খোকাবাবু। আমাকে চিনতে পারছ?

হ্যাঁ। তুমি খোকাবাবু। তোমাকে চিনতে পারছি।

আর সবাই কে কোথায় গেল?

কেউ নেই।

কোথায় গেল?

মরে গেছে।

তুমি একা?

আমি একা।

অনেকক্ষণ বাদে বাদে একবার করে গাঁইতির শব্দ হয়। তারপর চুপ। লোকটা হাঁফায়। লোকটা কাশে। জ্ঞানের চোখে জল আসে। একা লাগে। ভয় করে।

সে চেঁচিয়ে ওঠে, আমি খোকাবাবু! আমাকে মনে আছে তোমার?

হ্যাঁ, তুমি খোকাবাবু। তোমাকে আমার খুব মনে আছে।

জ্ঞান হাঁটুতে মুখ গুঁজে কেন কাঁদে কে জানে! বড্ড কান্না পায় তার।

শুনতে পাচ্ছ!

পাচ্ছি।

আমার বড় একা লাগছে। ভয় করছে।

আমারও বড় একা লাগে। ভয় করে।

আমি তোমার কাছে যেতে চাই।

অন্ধকারে আমাকে কী করে খুঁজে পাবে?

আমার ভয় করছে। আমি তোমার কাছে যেতে চাই। তুমি কোথায়!

অনেক দূরে।

কিন্তু আমি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি যে!

খাদানে বড় শব্দের বিভ্রম। দূরের শব্দও কাছে বলে মনে হয়।

জ্ঞান হামাগুড়ি দিয়ে এগোয় আর বলে, আমাকে তোমার কাছে যেতেই হবে।

পারবে না। আমি কোথায় তা আমিই জানি না।

ভয়— ভীষণ ভয়ে জ্ঞান চিৎকার করতে থাকে, না—না—না—না—

ঘুম ভেঙে জ্ঞান কিছুক্ষণ বুরবকের মতো চেয়ে রইল। ভয়ের রেশটা কাটেনি এখনও। সে কোথায় তা বুঝতে একটু সময় লাগল তার।

বাইরে ভোর হচ্ছে।

জ্ঞান উঠে বসল। জানালা দিয়ে চেয়ে রইল বাইরের দিকে। পুব দিকটা ঢেকে একটা বাড়ি উঠছে। কিছু দেখার নেই।

আজ বন্যার সঙ্গে দেখা হবে।

সকালটা আনমনে কেটে যাচ্ছিল জ্ঞানের। বুকটা মাঝে মাঝে দুরদুর করছে আশঙ্কায়। কেন ডেকেছে তাকে বন্যা? এতদিন পর, সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে, ফের এই ডাকা কেন? বন্যাকে দেখে কেমন প্রতিক্রিয়া হবে তার নিজের!

চা দিতে এসে মা বলল, আজ বন্যা নামে সেই মেয়েটার সঙ্গে তোর দেখা করতে যাওয়ার কথা না?

হ্যাঁ মা।

একটু ফিটফাট হয়ে যাস।

জ্ঞান অবাক হয়ে বলে, ফিটফাট হয়ে কেন?

আজকাল গাঁয়ে থাকতে থাকতে তোর পোশাকআশাকের দিকে নজর নেই। যা খুশি তাই পরিস। লোকে কী বলে? দাড়িটাও তো কামানো নেই!

জ্ঞান নিজের গালে একটু হাত বুলিয়ে বলে, কী হবে সেজে?

ফিটফাট থাকলে মনটাও ভাল থাকে। উলোঝুলো পোশাক পরলে লোকে পাত্তা দিতে চায় না।

জ্ঞান একটু হাসল মাত্র। ম্লান হাসি।

আজ শনিবার। ছুটির দিন। দয়া আর বিদ্যা অনেক বেলা অবধি ঘুমোয়। বাঁচোয়া। সাড়ে নটার কাছাকাছি বেরিয়ে পড়ল জ্ঞান।

মিনিবাস ধরে সন্তোষপুর। ঠিকানাটা খুঁজে বের করতেও বেশি বেগ পেতে হল না। একজন দোকানদার দেখিয়ে দিল, ওই লাল বাড়ি।

খুব ধীর পায়ে, কাঁপা বুকে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগল জ্ঞান। কী হবে! কী যে হবে! বুক কাঁপছে। হাত-পা অবশ লাগছে। নিশ্চয়ই তার

জন্য আর কোনও অপমান বন্যার ভাঁড়ারে বাকি নেই!

তিনতলার ফ্ল্যাটের দরজায় পিতলের নেমপ্লেটে দুটি নাম। ওপরে বন্যা মিত্র। নীচে অলক মিত্র। দরজার সামনে একটু দাঁড়িয়ে থাকে জ্ঞান। পাঁচ বছরের অপরিচয়ে।

না এলেই হত। কেন যে এল জ্ঞান! কীসের আশায়? নিছক কৌতূহল ছাড়া আর কিছু?

কলিংবেলের দিকে হাত তুলতে যাচ্ছিল জ্ঞান। আর তখনই ধীরে ভুতুড়ে দরজার মতো আস্তে করে খুলে যেতে লাগল পাল্লাটা।

এসো।

জ্ঞান প্রথমটায় কাউকে দেখতে পেল না। চেয়ে রইল।

জুতো খুলতে হবে না। ভিতরে এসো।

কপাটের আড়াল থেকে একটা নাইটি বা হাউসকোটের অংশ একটুখানি বেরিয়ে আছে। হালকা গোলাপি রঙের জমির ওপর খুব বড় বড় মেরুন রঙের ফুল।

চৌকাঠ ডিঙোতে যেন সাতসমুদ্দুরের ব্যবধান। হাতে পায়ে জড়তা। বুকের ভিতরে কাঁপন। মৃদু আবেগ। বিস্মৃত, ঘুমন্ত এক অভিমানের হঠাৎ জেগে-ওঠা। আর অপমানের জ্বালা। সব একসঙ্গে টের পাচ্ছিল জ্ঞান। সেইসঙ্গে একটু হাহাকারও।

দরজাটা মৃদু শব্দে বন্ধ করে দিয়ে বন্যা লাজুক গলায় বলল, এসো জ্ঞানাঞ্জন। আমি কখন থেকে অপেক্ষা করে আছি।

মুখোমুখি ঘরখানা খুবই বড়লোকদের ঘরের মতো সাজানো। দেয়ালজোড়া ঝকঝকে ক্যাবিনেট, তাতে স্টিরিও, টিভি, কম্পিউটার, মহার্ঘ কাঠের সোফাসেট, নীচে লাল কার্পেট। পিতলের মস্ত মস্ত ভাসে কিছু গাছপালা, দেওয়ালে পেইন্টিং, একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসানো কাচের টেবিল এবং আরও কত কী। পাখা, আলোর ব্র্যাকেট, পোড়ামাটির মূর্তি সব কিছুতেই ছড়িয়ে আছে টাকা। অলকের যে অনেক রোজগার তা এক লহমায় বুঝে যায় সে।

খুব মৃদু স্বরে বন্যা বলে, এই সোফাটায় বোসো, পাখার নীচে। ঠান্ডা জল খাবে? আজ যা গরম!

'এই ভ্রমর একদিন আমার ছিল।' কে যেন বলেছিল কথাটা! কৃষ্ণকান্তের উইলের গোবিন্দলাল না!

নিজেই ফ্রিজ খুলে বোতল বের করে সযত্নে জল মিশিয়ে ঠান্ডা কমিয়ে নিয়ে এল। পিরিচের ওপর স্বচ্ছ গেলাস, ঢাকা দেওয়া।

জলটার প্রয়োজন ছিল জ্ঞানের। তেষ্টার জন্য নয়, একটু ডাইভারশনের জন্য। তার নার্ভাস লাগছে। বন্যার দিকে ভাল করে তাকাতে পারছে না সে। পাঁচ বছরে বন্যা হয়তো একটু শীর্ণকায়া হয়েছে, চুল আঁচড়ায়নি ভাল করে, মুখে সামান্য বিশুষ্কতা। তবু দ্বিগুণ সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। সাদাটে ঠোঁটদুটি আজও তেমনই দুটি পাপড়ির মতো ফুটে আছে।

সসংকোচে বন্যা বলল, এ ঘরে এয়ারকুলার আছে। চালিয়ে দেব?

না, দরকার নেই।

মুখোমুখি সামান্য দূরত্বে আস্তে করে বসল বন্যা। দু হাতে মুখটা কিছুক্ষণ চাপা দিয়ে রাখল।

অনেকদিন বাদে তোমাকে দেখে আমার যে কেমন লাগছে! আমাকে স্বাভাবিক হতে একটু সময় দেবে?

জ্ঞানের হাতে গেলাস একটু কাঁপছে। এটা নিশ্চয়ই রিয়ালিটি নয়। কোনও স্বপ্নদৃশ্যের মধ্যেই বসে আছে সে। যে কোনও সময় ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসবে সে। বলবে, ধুস্!

আস্তে দুখানা হাত মুখ থেকে সরিয়ে জ্ঞানের দিকে তাকাল বন্যা। মুখে হাসি নেই। ভারী করুণ দেখাচ্ছে তাকে।

তুমি কিন্তু একবারও জিজ্ঞেস করনি আমি তোমার ফোন নম্বর কী করে পেলাম।

জ্ঞান কিন্তু একটু থতমত খেয়ে বলল, কথাটা মনেই হয়নি। তোমার ফোন পেয়ে কাল আমিও একটু কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলাম।

অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে মশাই!

কীভাবে পেলে?

তোমাদের কলিয়ারির নামটা আমার মনে ছিল। তোমার বাবা সেখানকার সেফটি ম্যানেজার, তুমি বলেছিলে। ওঁর নামটা জানা ছিল না। মিস্টার চক্রবর্তী, সেফটি ম্যানেজার ঠিকানায় একটি চিঠি দিয়েছিলাম।

অবাক হয়ে জ্ঞান বলে, বাবাকে?

ভয় পেয়ো না, চিঠিটা আমার নামে দিইনি। দিয়েছি অলকের নামে। লিখেছিলাম, জ্ঞানাঞ্জন আমার পুরনো বন্ধু! এখন তার কোনও খবর জানি না। যদি উনি দয়া করে ঠিকানা বা ফোন নম্বর জানান। কোনও অন্যায় করিনি তো!

না, অন্যায়ের কথা নয়। তবে অলকবাবু শুনলে হয়তো রাগ করবেন।

একটু চুপ করে থেকে বন্যা মাথা নেড়ে বলল, রাগ করবে না।

প্রকাশ্য রাস্তায় তাকে মেরেছিল অলক। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল ফুটপাতে। অপমানের একটু জ্বালা ভিতরে কোথাও রয়ে গেছে। সেই অপমান বন্যা দেখেছিল চোখ চেয়ে। করুণাভরে তাকে আরও লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচিয়েও দিয়েছিল।

একটা বড় শ্বাস চেপে গেল জ্ঞান।

কেমন দেখছ আমার ঘরদোর?

জ্ঞান একবার চোখ তুলে চারদিকটা দেখে নিয়ে বলল, খুব ভাল।

তুমি কি ইমপ্রেসড?

হ্যাঁ। তুমি খুব ভাল আছ।

বন্যা ম্লান একটু হেসে বলল, এত ডেকোরেশন আমার পছন্দ ছিল না। সব অলক করেছে।

রুচি আছে।

তা আছে। কিন্তু ভাড়া করা ফ্ল্যাটে কেউ এতসব করে?

ভাড়া করা? আমি ভেবেছিলাম এ বোধহয় তোমাদের নিজস্ব ফ্ল্যাট।

মাথা নেড়ে বন্যা বলে, না। তবে ফ্ল্যাটটা বাড়িওলার কাছ থেকে কিনে নেওয়ার কথা চলছিল। সেটা আর হয়নি।

কেন হয়নি তা আর জানতে চাইছিল না জ্ঞান। এইসব বৈষয়িক কথা শোনার জন্য তো সে আসেনি!

গত ফেব্রুয়ারিতে আমরা সিমলিপালে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমি আর অলক। সেখান থেকেই দুজনে জ্বর নিয়ে ফিরি। ভীষণ জ্বর। মাত্র দুটি প্রাণী আমরা, দেখার কেউ নেই। আর সে কী জ্বর! দু'জনেরই ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া ধরা পড়ে। দুজনেই নার্সিংহোমে ভর্তি হই। আমি আস্তে আস্তে রিকভার করতে থাকি। কিন্তু অলকের অবস্থা ডিটোরিয়েট করতে থাকে। শেষে কোমা হয়ে গেল।

সে কী?

দিন সাতেক বাদে অলক মারা যায়।

গড!

তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল বন্যা। বেশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর হঠাৎ বলল, জ্ঞান, তুমি বড় ভাল মানুষ।

জ্ঞান অবাক হয়ে বলে, হঠাৎ এ কথা কেন?

অলক তোমাকে ভীষণ অপমান করেছিল, মনে আছে? অন্য কেউ তোমার জায়গায় হলে কী হত জান? তার মুখ হঠাৎ খুশিতে উজ্জ্বল

হয়ে উঠত। তুমি প্রতিশোধ নিতে পারনি, হেরে গেছ। কিন্তু তোমার হয়ে প্রকৃতি তো প্রতিশোধ নিয়েছে!

জ্ঞানের কান গরম হয়ে উঠল অপমানে। সে গম্ভীর হয়ে বলল, এসব বলার জন্যই কি ডেকেছিলে আমাকে?

না জ্ঞান। আমি আসলে উলটো কথাটাই বলতে চাইছি যে! আমি দেখলাম অলকের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তোমার মুখটা যেন নিবে গেল। তুমি দুঃখ পেলে। সেইজন্যই তো বললাম, তুমি বড় ভাল মানুষ।

এই কমপ্লিমেন্টের কোনও দরকার ছিল না বন্যা।

বন্যা একটু চুপ করে থেকে বলল, এটা তো প্রতিশোধের যুগ। সবাই কেবল প্রতিশোধ নিতে চায়।

প্রতিশোধস্পৃহা মানুষের জন্মগত। বরাবরই ছিল। নতুন নয়।

আমি তোমাকে অপমান করব বলে কথাটা বলিনি।

জ্ঞান একটু কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, জানি। আমাকে নতুন করে আবার অপমান করলে তোমার তো কোনও লাভ হবে না।

বন্যা বলল, একটু বোসো। তোমার জন্য একটু কফি বা চা করে আনি।

ওসব থাক বন্যা। আমি খুব বেশি চা খাই না।

কিছু খাবে?

না। সপ্তাহে একবার বাড়ি আসি। মা ঠেসে খাইয়ে দেয় সবসময়।

তা হলে কী করি তোমার জন্য?

কথা বলো। তা হলেই হবে।

কী বলব, কীভাবে বলব তাই ভাবছি। তোমার সামনে বসে আছি, এটাই তো অবিশ্বাস্য লাগছে! কোনওদিন তোমার মুখোমুখি হতে পারব ফের, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। কেমন কাঁটা দিচ্ছে গায়ে, দেখো!

জ্ঞান একটা শ্বাস ফেলে বলল, তোমার কিছু হয়নি? ছেলেমেয়ে কিছু?

না। আমার বয়সই বা কী বলো। সবে চব্বিশ। ইচ্ছে ছিল আরও দু বছর পর।

জ্ঞান শুধু বলল, ও।

পিছুটান রাখিনি আমরা। খুব বেড়াতাম। অলক দু হাতে টাকা ওড়াতে ভালবাসত। ওড়াবেই বা না কেন বলো! রোজগারও করত অনেক। সঞ্চয়ের ধার ধারত না। বলত জীবনে আমি যত রোজগার করব তত খরচই করে উঠতে পারব না কোনওদিন।

জ্ঞান মাথা নেড়ে বলল, নবীনবাবুর কাছে শুনেছিলাম উনি খুব ভাল চাকরি করেন।

সফটওয়্যারের উইজার্ড। বছরে একবার করে আমেরিকার সিলিকন ভ্যালিতে যেতে হত। দুবার আমিও সঙ্গে গেছি।

জ্ঞান খুব মৃদুস্বরে বলল, এ কয়েকটা বছর তোমার খুব ভালই কেটেছে বলো!

বন্যা একদৃষ্টে তাকে ফের দেখে এবং অনেকক্ষণ কথা বলে না। তারপর হঠাৎ বলে, তোমার কী মনে হয়?

জ্ঞান অবাক হয়ে বলে, আমার! আমার কী মনে হবে? তোমাদের জীবন কেমন কাটছে তা তো আমি দেখতে আসিনি।

দেখলেও কি বুঝতে পারতে? একজন অত্যন্ত উচ্চমানের সফটওয়্যারম্যান, অনেক মাইনে, ফুর্তিবাজ একজন মানুষের বউ বলে কথা! মনে হত সুখ বুঝি আর ধরছে না। তাই না?

সেরকমই তো হওয়ার কথা বন্যা।

কিন্তু হল কই বলো!

হল না?

হল আবার হলও না। হয়তো একটু বেশিই হল, আনন্দ বা সুখ খুব বেশি হওয়াও কি ভাল!

জ্ঞান একটু হেসে বলে, তা তো জানি না। আমাদের জীবনে ওসব জিনিস তো বেশি নেই।

মাথা নেড়ে বন্যা বলল, তুমি জানো না জ্ঞানাঞ্জন, আনন্দের বা ফুর্তির কী সাঙ্ঘাতিক প্রকাশ আমি দেখেছি। ডিসকোথেকে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাচছে, মদ খাচ্ছে তো খাচ্ছেই, কিন্তু নেশা হচ্ছে না। নেশা হচ্ছে না বলে অস্থির হয়ে হাশিস না কী যেন খেতে ছুটছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাগলের মতো জুয়া খেলছে। হারছে, জিতছে, চেঁচাচ্ছে। এতসব করার পরেও বাড়িতে এসে দু দণ্ড বসে থাকতে পারত না। কেবল বলত, লেট আস ডু সামথিং... লেট আস ডু সামথিং। কী করত জান? কখনও স্টিরিও, কখনও টি ভি, কখনও রেডিয়ো চালিয়ে দিত চড়া ভলিউমে। কখনও কখনও একসঙ্গে তিনটেই। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে নাচত, লাফাত, চেঁচাত। পাগলের মতো। এত অস্থিরতা আমি কোনও মানুষের দেখিনি কখনও। অথচ অফিসে সাঙ্ঘাতিক সুনাম ছিল। কাজের লোক হিসেবে খাতির পেত। কিন্তু কাজের সময়টুকু বাদ দিলে সারাক্ষণ ওই ফুর্তি, উন্মত্ততা। আমি ওর গতির সঙ্গে কি পারি? চট

করে হাঁফ ধরে যেত আমার। বিয়ের পর চারটে বছর অলকের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে আমি হাঁফিয়ে পড়েছিলাম। আমি ওকে বলতে শুরু করেছিলাম, আমি পারছি না। লেট আস কুইট। একদিন নেশার ঘোরে কথাটা শুনে ও আমাকে প্রচণ্ড মেরেছিল।

জ্ঞান বলল, খুবই দুঃখের ব্যাপার।

হ্যাঁ জ্ঞানাঞ্জন। আমাদের সুখ ছিল বড্ড বেশি, টাকা ছিল বড্ড বেশি, ফুর্তি ছিল বড্ড বেশি। একই কেবিনে আমার পাশের বেডে যেদিন ও মারা যায় আমি হঠাৎ খুব একটা শান্তি বোধ করেছিলাম। যেন দীর্ঘ ক্লান্তির পর বিশ্রাম। কাঁদিনি তা নয়। অভাব বোধ করিনি তাও নয়। তবু এক ধরনের ছুটিও পেলাম তো!

এটা হয়তো ওর কোনও মানসিক অসুখ। একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখালে পারতে।

তুমি এমনভাবে বলছ যেন আমি একজন পাকা বুদ্ধির মানুষ। মনের অসুখ কিনা তা কী করে বুঝব বলো তো! আমিও তো ওর সঙ্গে উড়ে বেড়াতাম, যে বয়সের যা। প্রথম প্রথম ওই উদ্দাম জীবন তো খারাপও লাগত না। মনে হত, এই তো জীবনের আসল স্বাদ, এই তো এনজয়মেন্ট। উইক এন্ডে মাঝে মাঝে আমরা কাঠমাণ্ডু চলে যেতাম। কেন জান? সেখানে একটা হোটেলে খুব বড় স্টেকে জুয়া খেলা হয়। তখন তো এসব ভালই লাগত।

অলকের ক্লান্তি ছিল না? মানুষ তো, রোবট তো নয়।

হ্যাঁ, ক্লান্তি ছিল। মাঝে মাঝে দেখতাম ঠোঁটের কষে ফেনা জমে উঠছে চিৎকার করে গান গাইতে গাইতে। মদ খেয়ে নেশা না হলেও ঝিমিয়ে পড়ত। কিন্তু ওই অবস্থাতেও ফের তেড়েফুঁড়ে উঠত। ঘুমোতে চাইত না, জিরোতে চাইত না। যেন ভিতরে ভীষণ একটা জ্বালা।

কীসের জ্বালা?

তা তো জানি না। আর শোনো, ওর অন্য মেয়েমানুষের প্রতি ঝোঁকও ছিল ভীষণ। কথাটা তোমাকে বলতে চাইছিলাম না।

এখন আর বলতে দোষ কী?

বড্ড অপমান লাগে। স্বামী যদি অন্য মেয়েমানুষের প্রতি আসক্ত হয় স্ত্রীর অপমান হয় না, বলো? ঝগড়া করলে বলত, একজন মেয়েমানুষে আমার হয় না। আই নিড মোর অ্যান্ড মোর। আবার আমাকেও ভালবাসত খুব। প্রচণ্ড। বলত, তুমি আমার পার্মানেন্ট, আর সব টেম্পোরারি। কিন্তু যার অনেক থাকে, তার পার্মানেন্টও কেউ থাকে না।

আমি খুব ইনসিকিয়োরড ফিল করতাম।

জ্ঞান মাথা নেড়ে বলল, বুঝেছি। বিয়ের পর তোমার টার্বুলেন্ট একটা পিরিয়ড গেছে।

হ্যাঁ। ওর সঙ্গে থাকলে আর কিছুদিন পরে আমি ঠিক পাগল হয়ে যেতাম। ওর মৃত্যু আমি নিশ্চয়ই চাইনি, কিন্তু ক্লাচ্ থেকে বেরিয়ে আসার দরকার ছিল। কোর্টকাছারি করতে হত। সেটা করতে হল না, এই যা। এসব শুনে আমাকে তোমার খুব নিষ্ঠুর বলে মনে হচ্ছে তো!

জ্ঞান একটু হাসল। নিষ্ঠুরতার কথাটা সে তুলতে চায় না। সে নিজেই বন্যার নিষ্ঠুরতার একজন ভিকটিম। সেই কথাটা তো আর বলা যায় না ওকে। সে শুধু বলল, আমার কি কোনও মন্তব্য করা উচিত?

শোনো জ্ঞানাঞ্জন, তোমাকে যখন আমি ভালবেসেছিলাম তখন সর্বস্ব দিয়েই ভালবেসেছিলাম। মেয়েদের যা দেওয়ার আছে সবই দিয়েছি তোমাকে। কিন্তু তখন আমার বয়স কী বলো! ওই বয়সে মেয়েদের মন তো স্থির হয় না। এটা ওটা বাছে। অনেককেই হয়তো একসঙ্গে ভালবেসে ফেলে। কাকে বাছবে তা বুঝতে পারে না। আমারও তাই হয়েছিল। ওই বয়সে মানুষ ভুল তো করতেই পারে।

জ্ঞান অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বলল, হ্যাঁ, তা তো হতেই পারে।

আমি দাদুর কাছে শুনেছিলাম সেইসময় তোমাদের আর একটা বিপর্যয় হয়েছিল। তোমার বাবা খনির শ্রমিকদের হাতে মার খান।

জ্ঞান একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, হ্যাঁ, সে অনেক লম্বা কাহিনী।

আমার ওপর তোমার হয়তো আজও রাগ আছে জ্ঞানাঞ্জন। কিন্তু ওই ঘটনার পর আমার ভিতরে কম জ্বালাপোড়া হয়নি! যেদিন অলক তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিল, তোমার ফ্যাকাশে মুখটা দেখে আমার এত কষ্ট হয়েছিল যে বলার নয়। সেই মুখের চেহারাটা আমি আজও ভুলিনি।

জ্ঞান সামান্য ম্লান হাসির চেষ্টা করে বলল, ওসব চিন্তা করছ কেন? যা ঘটে যায় তা তো আর ওলটানো যায় না, তাই ভুলে যাওয়াই ভাল।

ভুলতে পারছি না বলেই আফটার দিস ফ্রিডম অনেক চেষ্টা করে তোমাকে খুঁজে বের করেছি। ফোন করার সময় মনে হয়েছিল, তুমি খারাপ ব্যবহার করবে, কথার মাঝখানে ফোন রেখে দেবে। তুমি তা করনি। দেখা করতেও রাজি হলে। তবু ভয় ছিল শেষ পর্যন্ত হয়তো আসবে না। কিন্তু এলে। এখন পর্যন্ত তুমি আমাকে একটু অপমানও করনি।

জ্ঞান চোখ তুলে বলে, অপমান করব কেন?

তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়াটাও খুব নাটুকে হয়ে যাবে। কোনও মানেও হয় না তার। একজন আর একজনকে হয়তো বলল, ক্ষমা করো! এবং সেও হয়তো বলল, করলাম। ব্যস তাতেই কি সব মিটে যায়, বলো! মেটে না। ভিতরে একটু একটু বিষ ঠিকই থেকে যায়। ক্ষমা চাইব বলে তো আর তোমাকে আমি ডেকে আনিনি। তোমার ওপর আমি যে অন্যায় করেছিলাম তা ক্ষমা করা তো সহজ নয়।

জ্ঞান চুপ করে চেয়ে রইল।

আমার অবস্থা তো দেখছ! মিউজিয়ামের মতো সাজানো একটা ফ্ল্যাট। দেখে মনে হবে না জানি এদের কত টাকা! কিন্তু আসলে কিছুই তেমন নেই আমার। টাকাপয়সা নেই, বন্ধু নেই, আত্মীয় নেই।

টাকাপয়সা নেই কেন? অলকবাবু তো বড় চাকরি করতেন। প্রভিডেন্ট ফান্ড বা গ্র্যাচুইটি—

বন্যা মাথা নেড়ে বলল, ওদের চাকরিতে ওসব ছিল না। কন্ট্রাক্ট সার্ভিস। এসব চাকরির নাকি ওটাই নিয়ম। অলক মারা যাওয়ার পর ওর কোম্পানি শুধু দু মাসের পাওনা বেতন পাঠিয়ে দিয়েছে।

ব্যাঙ্কে কিছু জমেনি?

জমতে দিল কোথায়? জুয়াতে হারত, ফুর্তিতে টাকা ওড়াত। না জ্ঞানাঞ্জন, আমাদের সঞ্চয় বলে কিছু নেই। অলকের দুটো লাইফ পলিসি ছিল, দশ লাখ টাকার। তার নমিনি ওর মা। কয়েক লাখ টাকার ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেটও আছে। তারও নমিনি ওর মা। নমিনি চেঞ্জ করার তো প্রয়োজন হয়নি। তবু যা আছে তাতে আমার কয়েক বছর চলে যাবে। এই যে জিনিসগুলো দেখছ এগুলোর তেমন কোনও রিসেল ভ্যালু নেই। একজন দালাল এসে দেখে বলেছে বাজারে এসব অর্ধেক দামেও বিক্রি হবে না। ওই যে কম্পিউটারটা দেখছ ওটা বিদেশ থেকে আনা, লক্ষ টাকার ওপর দাম। ওটা ছাড়াও ওর ল্যাপটপ আর পামটপ দুটো কম্পিউটার আছে। কোনওটারই তেমন নাকি দাম নেই। মিউজিক সিস্টেমের বাজার স্যাচুরেটেড, কেউ কিনতেই চায় না। যাকগে, এসব যা হওয়ার হবে। সবচেয়ে খারাপ হল, আমার কোথাও নিজের জন নেই।

কেন নেই? তোমার বাপেরবাড়ি বা শ্বশুরবাড়ি?

আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে কায়স্থকে বিয়ে করেছি বলে বাবা আমার মুখদর্শন করে না। মায়ের অবশ্য সাপোর্ট ছিল, বাবার নয়। আর

শ্বশুরবাড়ির কথা না বলাই ভাল। শাশুড়ি তাঁর শাঁসালো ছেলের জন্য বোধহয় একটু বড় মাপের ডাওরি এক্সপেক্ট করে রেখেছিলেন। সেসব তো আর পাননি। আমাকে উনি স্বীকারও করেননি কখনও। না জ্ঞানাঞ্জন, দুটো বাড়ির দরজাই আমার কাছে বন্ধ।

তা হলে কী করবে তুমি?

একা থাকব। কত মেয়েই তো একা থাকতে বাধ্য হয়। রিসার্চ সবে শুরু করেছি। শেষ হলে হয়তো একটা চাকরি পেয়ে যাব কোথাও। একজন মানুষের তো বেশি কিছু দরকার হয় না।

এই ফ্ল্যাটে তুমি কি একদম একা থাক?

হ্যাঁ, সঙ্গে থাকার মতো তো কেউ নেই।

ভয় পাও না?

প্রথম প্রথম পেতাম। অলক মারা যাওয়ার পর যখন ফিরে এলাম তখন ভয়ে দম বন্ধ হয়ে আসত। জীবনে ভূতে বিশ্বাস করিনি। অথচ তখন রোজ রাতে মনে হত, এই বুঝি অলকের প্রেতাত্মা এসে দেখা দেবে! ওই বুঝি বাইরের ঘরে অলক কম্পিউটার অন করে বসল। বাথরুমে কে যেন শাওয়ার চালাল বা ফ্লাশ টানল। সে কী ভয়ংকর সব দিন গেছে। ঠিকে ঝি-কে হাতে পায়ে ধরে কয়েকদিন রাতে থাকতে রাজি করিয়েছিলাম। কিন্তু সে বেচারারও সংসার, ছেলেপুলে আছে। কতদিন আর থাকবে? সাহস করে একাই থাকতে শুরু করলাম। ধীরে ধীরে ভয়টা চলে গেল।

তোমার কি মানিটারি প্রবলেম আছে বন্যা? ফ্রাঙ্কলি বলো। তেমন প্রয়োজন হলে আমি কিছু মেটিরিয়াল হেলপ তো করতে পারি।

বন্যা হেসে বলল, তুমি এটা বলবে জানতাম। তুমি ভীষণ ভাল একজন মানুষ। কিন্তু তার দরকার নেই। অলকের কোম্পানি ওকে অনেক মাইনে দিত। লাখ টাকার কাছাকাছি বলে শুনেছি। তার সবটাই হোয়াইট নয়।

তা হলে?

কিছুটা দিত পার্কস এবং রি-ইমবার্সমেন্ট হিসেবে ব্ল্যাক মানিতে। এ টাকার বেশির ভাগই অলক উড়িয়ে দিত বটে, কিন্তু কিছু আবার এখানে সেখানে গুঁজে রেখে ভুলেও যেত। ও মারা যাওয়ার পর খুঁজে খুঁজে সেইসব টাকা আমি বের করেছি। সবটা এখনও গুনে উঠতে পারিনি। তবে দু-তিন লাখ টাকা হবে বোধহয়। তারপর যদি এইসব জিনিসপত্র বিক্রি করে দিই তা হলেও কিছু টাকা পাওয়া যাবে। একটা ওয়ানরুম

ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকলে আমার তেমন কোনও অসুবিধে হবে না। এসব নিয়ে তুমি ভেবো না। তোমাকে আমার দুঃখের কথা শোনাব বলে তো ডাকিনি। সত্যি কথা বলতে কী, আমার তেমন দুঃখ নেইও। বরং হঠাৎ একটা ফ্রিডম পেয়ে মনটা হালকা লাগছে। আচ্ছা, এটা কি খারাপ জ্ঞানাঞ্জন?

জ্ঞান একটু চুপ করে থেকে বলল, এক এক জনের জীবন এক এক রকম। খারাপ বলি কী করে?

আমাকে তোমার রাক্ষুসি বলে মনে হচ্ছে না তো!

তা কেন মনে হবে?

কিংবা পাগল?

না বন্যা।

আমার ওইটাই ভয়।

কীসের ভয়?

ওই যে বললাম, আমার তেমন দুঃখ হচ্ছে না, হালকা লাগছে। অথচ স্বাভাবিক নিয়মে উলটোটাই তো হওয়ার কথা। কাঁদবার কথা, হাহাকার করার কথা। সেসব হচ্ছে না বলে মাঝে মাঝে আমার নিজেকে নিয়ে খুব চিন্তা হয়। আমি কি হৃদয়হীন রাক্ষুসি? আমি কি আসলে পাগল! যখন মনে হয় তখন খুব ভয় করে, অলক মারা গেল, অথচ আমি কাঁদলাম না। নামমাত্র চোখের জল ফেলেছিলাম।

কান্না না পেলে মিথ্যে করে কাঁদবেই বা কেন?

কিন্তু কান্না পেল না কেন? চার বছর তো একসঙ্গে ছিলাম। আমার শোওয়ার ঘরে চড়াইপাখির বাসা আছে। একটা মা-চড়াই একদিন পাখার ধাক্কায় মরে গেল। তিনটে কুশি কুশি ছানা ভাল করে উড়তে পারে না, নেমে এসে মেঝের ওপর জড়সড় হয়ে বসে রইল। জল দিলাম, চাল দিলাম, মুড়ি দিলাম। কী খায় তা তো জানি না। কিচ্ছু খেল না। দুদিনের মধ্যে এক এক করে সব কটা মরে গেল। কী যে কষ্ট হয়েছিল কী বলব, কেঁদে বুক ব্যথা হয়ে গেল। চড়াইপাখিগুলোর জন্য কাঁদলাম, অলকের জন্য কান্নাই পেল না! আশ্চর্য নয়!

একা থাকলে কী হয় জান?

কী হয় জ্ঞানাঞ্জন!

একা থাকলে মানুষ অহেতুক চিন্তা করে, আর অহেতুক চিন্তা থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত সব সিদ্ধান্তে আসে।

একা থাকতে যে আমার আজকাল ভাল লাগছে। আই অ্যাম

কোয়াইট এনজয়িং ইট।

অলকের কথা আর ভেবো না। মৃতদের চিন্তা করলে আমরাও একটু একটু মরে যাই।

ওমা! কী সুন্দর বললে!

একটু লাল হল জ্ঞান। বলল, আমি বিজ্ঞ মানুষ নই। তোমার কথা শুনতে শুনতে মনে হল, তুমি বড্ড বেশি ভাবছ আজকাল। বরং পড়াশুনোয় আরও সময় দাও, কম্পিউটার নিয়ে সময় কাটাও, নিজেকে ব্যস্ত রাখো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বন্যা বলে, একাই কি থাকতে পারি জ্ঞানাঞ্জন!

একাই তো আছ!

একা থাকার জ্বালাও আছে। রং ফরসা, কম বয়স, সদ্য বিধবা। কারও কাঁধে মাথা রেখে কাঁদবার দরকার থাক বা না থাক, কত কাঁধই যে এগিয়ে আসে।

জ্ঞান হেসে ফেলল, কারা আসে?

কে নয় বলো!

একটু জ্বালা হল কী, এতকাল পরে, জ্ঞানের বুকের মধ্যে? এই ভ্রমর যে একদিন তার ছিল। তার? কত ভুল ভাবনা! তবু জ্বালা হল।

অলকের এক ডাকসাইটে সফ্‌ট্‌ওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু তো প্রায়ই এসে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। অ্যান্ড হি ইজ ভেরি সিনসিয়ার। আমার একজন ব্যাচেলর অধ্যাপক ছলো ছলো চোখে নিজেকে প্রায় স্যাক্রিফাইস করার মতো ওই একই প্রস্তাব দিতে গিয়ে বলেছেন, যদিও এই বিয়ে করলে আমার বাবা আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করবে, মা আমার মুখ দেখবে না, কিন্তু তবু তোমার জন্য— যা যা বলে আর কী বাঙালি শিভালরাস পুরুষেরা।

আরও আছে?

অনেক। এ পাড়ার একজন বিপত্নীক নিজে সামনে আসার সাহস পাননি। তবে টেলিফোন করে তিনি কত বড় চাকরি করেন, কীরকম স্ট্যাটাস সব প্রায়ই আমাকে বলেন। তিনি আমাকে সাবধান করে দিয়ে এও বলেন যে, এ পাড়ার কিছু বদ লোক নাকি আমার ওপর কুনজর দিচ্ছে। তাদের হাত থেকে তিনি আমাকে রক্ষা করতে চান বলেই অনিচ্ছে সত্ত্বেও আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত।

আর শুনতে চাই না।

বন্যার চোখে হাসি ঝিকমিক করছিল। বলল, সবচেয়ে মজারটাই

তো এখনও বলিনি! ইনি একদিন টেলিফোন করে সরাসরি বললেন, দেখুন ম্যাডাম, আমি একজন হ্যান্ডসাম, লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান লোক। বুদ্ধিমান, সরকারি অফিসার, মুখে বা গায়ে দুর্গন্ধ নেই, বাথরুম সং-এর গলা ভাল, স্মার্ট, বিস্তর জোকস জানি। আপনি কি আমাকে বিয়ে করতে রাজি? আমি ঠান্ডা গলায় বললাম, না। লোকটা তাতে একটুও দমে না গিয়ে বলল, বিয়ে না করলেও ক্ষতি নেই। বাট ইউ ক্যান ইজিলি হ্যাভ এ চাইল্ড বাই মি! এটা তো টেস্টটিউব বেবির যুগ, আপনার নিশ্চয়ই সংস্কার নেই। গ্যারান্টি দিচ্ছি, ছেলে বা মেয়ে যা-ই হোক সেটা ভালই হবে।

জ্ঞান লজ্জায় রাঙা হয়ে নিজের কপাল চেপে ধরে বলল, মাই গড!

তুমি তো মেয়ে হয়ে জন্মাওনি জ্ঞানাঞ্জন তাই এসব অভিজ্ঞতা তোমার কখনও হবে না।

জ্ঞান চোখ তুলে বলল, তুমি লোকটাকে এত কথা বলতে দিলে কেন? টেলিফোন রেখে দিলেই তো পারতে!

আমি একটু মজাও পাচ্ছিলাম। টেলিফোন রেখে দিলে লাভ হত না। লোকটা আবার ফোন করত।

তুমি লোকটাকে কী বললে?

খুব মিষ্টি করে বললাম প্রস্তাবটা আমি ভেবে দেখব। তারপর ওর ঠিকানাটা চাইলাম, যাতে প্রয়োজন হলে যোগাযোগ করতে পারি। লোকটা তখন টক করে নিজেই লাইন কেটে দিল।

মাই গড!

অনেকের ধারণা, অলক অনেক টাকা রেখে গেছে। সেইজন্যও অনেকে বিয়ে করবে বলে ছুঁক ছুঁক করে। একা থাকার এই একটাই অসুবিধে। লোকে বড্ড উপকার করতে চায়।

তোমার প্রবলেম বুঝতেই পারছি বন্যা।

ভুল বুঝো না। এসব কিন্তু আমার প্রবলেম নয়।

নয়?

না। এসব হচ্ছে ইউজুয়াল হ্যাজার্ডস। ডিস্টার্বিং ঠিকই। কিন্তু গায়ে না মাখলেও চলে। আগে গভীর রাতে মাঝে মাঝেই ফোন আসত। আজকাল রাতে শোওয়ার সময় ফোন নামিয়ে রেখে শুই। একা কী করে থাকতে হয় তা আস্তে আস্তে শিখে যাচ্ছি।

জ্ঞান বন্যার মুখের দিকে তাকাল। একটু আলুথালু, একটু রোগা, একটু শুষ্ক, তবু কী সুন্দর! এখনও বোধহয় হাঁটু গেড়ে বসাতে পারে

জ্ঞানকে। সে জিব দিয়ে নিজের শুকনো ঠোঁটকে একটু ভেজানোর চেষ্টা করে বলল, তা হলে কি তুমি ভাল আছ বন্যা?

বন্যা হাসল না, প্রগাঢ় চোখে জ্ঞানের দিকে চেয়ে বলল, তোমার কী মনে হয় জ্ঞানাঞ্জন?

জ্ঞান মাথা নেড়ে বলল, আমি বুঝতে পারছি না। তোমার কথা শুনে একবার মনে হচ্ছে তুমি ভাল আছ, আবার মনে হচ্ছে নেই।

দুটি সাদাটে ফরসা হাতের করতলে নিজের মুখ চাপা দিয়ে একটু চুপ করে রইল বন্যা। জ্ঞান বুঝতে পারছিল, হাতের আড়ালে বন্যা কাঁদছে। শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে কান্নার মৃদু কম্পন। সে অপেক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ উঠে একছুটে বন্যা চলে গেল ভিতরের ঘরে। জ্ঞান বসে থেকে বেসিনে জল পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল।

ঘড়িতে সোয়া এগারোটা। কিন্তু সময়টা অর্থহীন লাগছিল জ্ঞানের কাছে। সে সেন্টার টেবিল থেকে আধ-খাওয়া জলের গেলাসটা তুলে বাকি জলটুকু খেয়ে নিল।

বন্যা ফের ফিরে এসে সোফায় বসে বলল, সরি।

না না, ঠিক আছে বন্যা। আমি বুঝতে পারছি।

সামান্য ধরা, ভাঙা কান্নার রেশ মেশানো গলায় বন্যা বলে, কী বুঝতে পারলে জ্ঞানাঞ্জন?

বুঝতে পারছি তুমি একটা ক্রসরোডে আছ। ভাল আর খারাপ দুরকমই আছ তুমি।

মাথা নেড়ে বন্যা বলল, কিচ্ছু বোঝনি জ্ঞানাঞ্জন। আমি কখনও ক্রসরোডে ছিলাম না। আমি একটুও ভাল নেই। গত পাঁচ বছর ধরে কখনও ভাল থাকিনি আমি।

তা তো বলনি তুমি!

বলব কেন? তুমি কেন বুঝতে পারলে না! এখন পর্যন্ত তুমি একবারও জানতে চাওনি কেন ডেকেছি তোমায়! কেন এত আকুল হয়ে তোমার বাবার কাছে চিঠি দেওয়া, কেন সারারাত না ঘুমিয়ে জেগে থাকা, কেন সকাল থেকে অপেক্ষা করা!

আচমকা রক্তোচ্ছ্বাসে ভেসে গেল জ্ঞানের মুখ। একটু শ্বাসকষ্ট হতে লাগল। মুখটা নিচু করে নিজের করতলের দিকে চেয়ে রইল সে। বুকের ভিতর ভীষণ সামুদ্রিক ঝড়ে আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে পালতোলা একটা ছোট নৌকো। পাহাড়ের মতো ঢেউয়ের মাথায় উঠে যাচ্ছে,

আচম্বিতে নেমে যাচ্ছে অতল পাতালে।

তুমি! তুমিই আমাকে কখনও ভাল থাকতে দাওনি জ্ঞানাঞ্জন।

গভীর যন্ত্রণায় একটা অস্ফুট শব্দ করল জ্ঞান।

ভুল হয়েছিল। বড্ড ভুল হয়েছিল আমার। সেই একটা ভুল কত শোধ নিল আমার ওপর, জান? চোখধাঁধানো একটা লোক এসে মাথাটা ঘুরিয়ে দিল আমার। টাকা, বিদেশ, ফুর্তি, আনন্দ। কিন্তু সবসময় তুমি কাঁটা হয়ে ফুটে রইলে। কিছুতেই সেই কাঁটা তুলতে পারি না। কেন বলো, অত আনন্দের মধ্যে আমি হাঁফিয়ে পড়তাম বার বার! কেন ক্লান্তি আর অবসাদ আমাকে দুমড়ে মুচড়ে দিত! কেন পাশের বেডে যখন মরে যাচ্ছে অলক, তখন আমি রাক্ষুসি, আকুলভাবে অপেক্ষা করছি তার শেষ নিশ্বাসের জন্য! কেন স্বামী মারা যাওয়ার পর তার যুবতী স্ত্রীর মনে হয়, আঃ, আমি আজ স্বাধীন! আমি আজ মুক্ত! আর বন্ধন নেই! কেন মনে হয় জ্ঞানাঞ্জন?

জ্ঞান চুপ।

কেন মনে হয় জান?

জ্ঞান করতলের দিকে চেয়ে থাকে।

জান না জ্ঞানাঞ্জন?

ডিঙি নৌকোটা ডুবল। ডুবেই গেল। অনেকক্ষণ বাদে ফের জলের অতল থেকে উঠে এল ঢেউয়ের এক বিশাল পাহাড়ে চেপে। উঠে গেল আকাশে। ফের নামতে লাগল জলের উপত্যকায়। জ্ঞান মুখ তুলতে পারছে না।

জীবনে আমি কোনওদিন তোমার কাছে ক্ষমা চাইব না জ্ঞানাঞ্জন। গত পাঁচ বছর তুমি আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছ। কখনও একটুও সুখী হতে দাওনি আমায়। কোনওদিন ভুলতে দাওনি। কী গভীর, কী নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিয়েছ, তা কি তুমি জান? বার বার তোমার ফ্যাকাশে হতভম্ব মুখটা এসে অলককে আড়াল করেছে। চার বছরের বিবাহিত জীবনে একটু ভালবাসা তো হতেই পারত অলকের প্রতি আমার। হল না। আমি কিছুতেই পারলাম না। তুমি দিলে না। বলো কেন ক্ষমা চাইব তোমার কাছে?

জ্ঞান মাথা নেড়ে কিছু একটা বলতে গিয়ে দেখল, এখন কথা বলার কোনও মানেই হয় না। অসহায়ভাবে সে তাই চুপ করে গেল।

বিরহ কিছুতেই ভুলতে দেয় না, কিন্তু মিলন ভুলিয়ে দেয়। কথাটা কে বলেছিল বলো তো!

জ্ঞান মাথা নেড়ে বলল, মনে পড়ছে না।

মিলন হলে ভোলা খুব সোজা। রোজ তাকে চোখের সামনে দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে তার রহস্যের অবসান ঘটে যায়। সে চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও ভুলতে থাকে মানুষ। কিন্তু যে দূরে সরে যায়, যাকে পাওয়া গেল না, যে এল না জীবনে তার ইমেজ দিন দিন বেড়ে ওঠে। কী সাঙ্ঘাতিক বলো!

এবার জ্ঞান একটু হাসল।

শুধু তোমার জন্যই আমি আজও ভাল নেই জ্ঞানাঞ্জন। একটুও ভাল নেই। অলক মারা গেছে, পয়সাকড়ি নেই, বাবা-মার সঙ্গে সম্পর্ক রইল না, শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক তৈরিই হল না, তবু এসব আমার খারাপ থাকার কোনও কারণ নয়। একটা মেয়ে এই সমাজে এখনও একা বেশ বেঁচে থাকতে পারে। রক্ষকের কোনও দরকার হয় না তার। ভক্ষকদেরও ঠেকিয়ে রাখা শক্ত নয়। কিন্তু তার আগে তোমাকে আমার ভোলা দরকার।

জ্ঞান যে কী বলবে তা খুঁজেই পাচ্ছে না। বন্যা আর অলকের জীবনে তার ছায়াটুকু আছে বলেও তার কখনও মনে হয়নি। ঝাড়গ্রামের এক গাঁয়ে ছাত্রছাত্রীদের অঙ্ক শেখাতে শেখাতে সে তো কত মানুষের কাছেই বিস্মৃত হয়ে গেছে!

তোমাকে না ভুললে আমি বাঁচবো কী করে? কাল তোমার গলা শুনে কাঁটা দিল শরীর। তুমি অপমান করলে না। এমনকী আসতে রাজি হলে। স্বপ্নেও ভাবিনি তো। এমন অদ্ভুত আনন্দ হয়েছিল যে সারা রাত একটুও ঘুম হল না। আজ সকাল থেকে বসে আছি তোমার জন্য। কিছু খাইনি, ঝিকে তাড়াতাড়ি বিদেয় করে কতবার দরজায় গিয়ে ফুটোতে চোখ রাখছি। কখন আসবে।

বন্যা—! বলে ফের থেমে গেল জ্ঞান।

বিরহ ভুলতে দেয় না, কিন্তু মিলন ভুলিয়ে দেয়। আমি তোমাকে ভুলতে চাই জ্ঞান।

বন্যা উঠে এল ধীর পায়ে। সমস্ত মুখে রক্তিম আভা। এলো চুল উড়ছে হাওয়ায়। হাঁটু গেড়ে পায়ের কাছে বসে উর্ধ্বমুখে চেয়ে বলল, ভুলিয়ে দাও জ্ঞান।

জ্ঞানের চোখে আবেগে জল আসতে চাইছিল। স্খলিত কণ্ঠে বলল, কী করে ভোলাব?

দু হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে চোখে চোখে চেয়ে থাকে বন্যা।

শ্বাসে শ্বাস, একের হৃৎপিণ্ডের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে অন্যের বুকে। দুটি পাপড়ির মতো সাদা ঠোঁট কাঁপছে।

কতক্ষণ ধরে তাকে চুমু খেয়েছিল বন্যা কে জানে। সময়ের কোনও হিসেব ছিল না জ্ঞানের। চেতনাও ছিল কি না কে জানে। স্বর্গের ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছিল কি?

পাঁচ

পিঠে কী খুঁটছিস রে? আমার কি ঘামাচি হয়েছে?

না তো?

তা হলে?

দেখছিলাম কালো মতো গুটলি পাকানো কী যেন। মনে হল ডাঁশটাঁশ কিছু কিনা।

যাঃ, ডাঁশ আসবে কোত্থেকে?

তুমি তো গাঁয়ে থাক। ভাবলাম ওখান থেকেই নিয়ে এসেছ বুঝি, তাই খুঁটে দেখলাম। ডাঁশ নয়, একটা কালো গোটা মতো।

উপুড় হয়ে শোওয়া জ্ঞান চোখবোজা অবস্থাতেই একটু হাসল। বলল, তুই ডাঁশ চিনিস?

চিনব না কেন?

ছাই চিনিস। মানুষ নয়, ডাঁশ খায় গোরুকে।

যা-ই বলো গাঁয়ে কিন্তু বড্ড পোকামাকড়।

তোদের বিয়ে তো গাঁয়েই হবে। গাঁয়ের লোক ছাড়া দু জনকে একসঙ্গে বিয়ে করবে কে? কটা বাজে বলবি?

দাদাব পিঠে একটা চিমটি কেটে বিদ্যা বলল, চারটে।

মা ঘুম থেকে উঠেছে?

মা দুপুরে ঘুমোয় নাকি? ছাদে গেছে ভেজা জামাকাপড় ওলটাতে। ঘুমোচ্ছে বাবা। শেষরাতে উঠে ট্রেন ধরে এসেছে তো! রাতে ভাল ঘুম হয়নি।

চা করবি?

করব, তবে একটু দেরি হবে।

কেন, দেরি হবে কেন?

রান্নাঘর এনগেজড। দুটো গ্যাস উনুনেই রান্না হচ্ছে।

রান্না! বিকেল চারটের সময় কীসের রান্না?

দয়া আর সতী দুজনে মিলে একটা নতুন রান্না করছে।

সতী! সে এসেছে নাকি?

রেসিপিটা তো ওরই। জিনিসটার নাম কিমা ভরপুর। আলুর ভিতরটা কুরে নিয়ে তাতে কিমা, ক্যাপসিকাম, মাশরুম, ডিমের টুকরো এসব দিয়ে পুর দিতে হয়, গ্রেভি হয় কাজুবাদাম বাটা আর ক্রিম দিয়ে, এখন একটা উনুনে কিমা তৈরি হচ্ছে, অন্যটায় সেদ্ধ হচ্ছে আলু।

এই গরমে অত রিচ খাওয়া!

ওরকম বোলো না তো! তোমার জন্যই কষ্ট করে বানানো হচ্ছে।

কেন, আমার জন্য কেন? আজ কি আমার জন্মদিন?

ভ্যাট। তোমার জন্ম তো নভেম্বর মাসে।

তা হলে উপলক্ষটা কী?

তুমিই উপলক্ষ। সারা সপ্তাহ তো কচুঘেঁচু খেয়ে থাক। বাড়িতে এলে একটু ভালমন্দ খাওয়াব না আমরা?

দুপুরে যা খেয়েছি তাই তো গলা অবধি হয়ে আছে।

আহা, এখনই তো নয়। খাবে তো রাত্রে।

তাই এই গরম দুপুরে মেয়েটাকে বেহালা থেকে টেনে এনেছিস?

মোটেই টেনে আনিনি। নিজেই এসেছে। কিমাও তো ওই নিয়ে এল।

মেয়েটাকে এভাবে কষ্ট দেওয়ার কোনও মানে হয় না।

কেউ যদি কারও জন্য কষ্ট করে আনন্দ পায় তা হলে কী করা যাবে বলো!

জ্ঞানের কানটা হঠাৎ গরম হয়ে উঠল। মুখটা বালিশে ডুবিয়ে দিয়ে বলল, পিঠটা চুলকে দে তো! খোঁটাখুঁটি করেছিস তাইতেই এখন পিঠ চুলকোচ্ছে।

দাঁড়াও, একটু পাউডার দিয়ে নিই। যা ঘেমেছ!

তোর নখে ভীষণ ধার। কেন যে শাকচুন্নির মতো বড় বড় নখ রাখিস! বড় দাঁড়ার চিরুনিটা নিয়ে আয়।

যতক্ষণ চিরুনি আর পাউডার আনতে গেল বিদ্যা ততক্ষণ বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইল জ্ঞান। কী হচ্ছে এসব? কী হচ্ছে? ওই বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে কী ষড়যন্ত্র করতে চাইছে তার বিচ্ছু দুটো বোন?

বিদ্যা খুব যত্ন করে পিঠ চুলকোতে চুলকোতে বলল, কী কথা হল?

জ্ঞান অবাক হয়ে বলে, কীসের কী কথা?

আজ যার সঙ্গে দেখা করতে গেলে? বন্যা।

জ্ঞান কিছুক্ষণ স্থির হয়ে চুপ করে রইল। তারপর বলল, তা দিয়ে তোর কী দরকার?

আহা, নিশ্চয়ই কোনও জরুরি ব্যাপার ছিল। নইলে সাত তাড়াতাড়ি আমরা ঘুম থেকে ওঠার আগেই অমন হুটপাট করে চলে যেতে না।

তোরা তো কুম্ভকর্ণ। বেলা এগারোটার আগে ঘুম থেকে উঠিস?

মোটেই এগারোটায় নয়। আমরা উঠেছি ঠিক নটা পঁয়ত্রিশে। তুমি বেরিয়েছ নটা কুড়িতে।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল যে!

ভদ্রমহিলার কি কোনও বিপদ?

তা জেনে কী হবে?

কবেকার চেনা বলো তো?

ওঃ, বড্ড জ্বালাস।

বলোই না দাদা। জীবনে কখনও কোনও মহিলার সঙ্গে তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা শুনিনি। তুমি তো মেয়েদের অ্যাভয়েড কর।

অ্যাভয়েড করব কেন? আমার কত ছাত্রী আছে জানিস? মেয়েদের অ্যাভয়েড করলে কি চলে?

এই মহিলা কি তোমার ছাত্রী?

মনে মনে প্রমাদ গুনে জ্ঞান বলল, না।

কবেকার চেনা?

বছর পাঁচেক।

বন্যা কি ম্যারেড?

কে বলল?

মা বলছিল।

তার মানে এটা নিয়ে তোদের আলোচনা হয়েছে। তাই তো?

মা ভয় পাচ্ছিল, রাতের জরুরি ফোন, সকালে উঠেই তোমার যাওয়া, বোধহয় ভদ্রমহিলার কোনও বিপদ হয়েছে। তাই কি?

জ্ঞান খুব ভাল মিথ্যেবাদী নয়। মিথ্যে কথা সে একদম বলতে পারে না। তাই তার বুক ঢিবঢিব করছিল ভয়ে। একটু চুপ করে থেকে সে বলল, হ্যাঁ।

কী বিপদ?

মেয়েটার স্বামী হঠাৎ মারা গেছে।

আহা রে! কত বয়স?

বয়সটা বলতে বাধো বাধো ঠেকছিল। বয়স বললে আবার কৌতূহল বাড়বে হয়তো। কোনওরকমে বালিশ খামচে ধরে বলল, বয়স কি আর জিজ্ঞেস করা যায়? সাতাশ-আঠাশ হবে হয়তো।

ছেলেমেয়ে নেই?

জ্ঞান আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, না।

তা হলে তো ইচ্ছে করলেই আবার বিয়ে করতে পারে। তোমার সঙ্গে কী করে আলাপ হল?

উঃ, তুই শুধু একটা জায়গায় চিরুনি ঘষছিস! জ্বালা করছে। বাঁ

দিকটা চেপে দে।

দিচ্ছি বাবা দিচ্ছি। বকো কেন? কী করে আলাপ হল বললে না?

হয়ে গেল।

রাগ করলে নাকি?

আরে না। রাগের কী? একসময় লেকটাউনে থাকতাম তো, সেখানেই আলাপ হয়েছিল। মাত্র এক-দেড় মাসের আলাপ। তারপর বিয়ে হয়ে যায়।

মাত্র এক-দেড় মাসের আলাপ?

হ্যাঁ।

তাইতেই পাঁচ বছর বাদে টেলিফোনে জরুরি তলব? আর তোমারও ছুটে যাওয়া!

মিথ্যে গল্প সে বানাতে পারে না মোটেই। কিন্তু ক্রমশ বিপদের মধ্যে চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরে সে বিভ্রান্ত মাথা থেকে একটা গল্প বের করল। বলল, আসলে আমার এক বন্ধুর বউ।

বন্ধুর বউ?

হ্যাঁ।

কোন বন্ধু বলো তো? অমরেশ, ভাস্কর, শিলাদিত্য, নবেন্দু, প্রাণগোপাল, সুজিত, দেবল, কৌশিক, না আর কেউ?

শিউরে উঠল জ্ঞান। তার খেয়াল ছিল না তার দুটি বোনেরই স্মৃতিশক্তি সাংঘাতিক। এইসব বন্ধুদের যে কারও নাম বলে দিতে পারত সে। কিন্তু এরা কেউ মারা যায়নি এবং সকলের সঙ্গেই তার যোগাযোগ আছে। কারও কারও সঙ্গে যোগাযোগ ক্ষীণ, কিন্তু আছে। মিথ্যেটা বলতে সে আর সাহস পেল না। বলল, তোরা চিনবি না। অলক মিত্র।

অলক মিত্র? যাঃ, এই নামে আবার কে বন্ধু ছিল তোমার? সব বন্ধুর গল্পই তো তুমি আমাদের কাছে করেছ! কে ট্যারা, কে বকের মতো হাঁটে, কে কৃপণ, কে মাঝরাতে উঠে চান করে, কার ভূতের ভয়।

সব বন্ধুর কথা কি আর বলেছি? হয়তো এর কথা তেমনভাবে মনে হয়নি।

তা হলে অলক মিত্র তোমার তেমন বন্ধু নয় বলো!

না। তেমন ঘনিষ্ঠ নয়। তাই ওর কথা ওঠেনি।

ঘনিষ্ঠ নয়, তবু তার বউ ডাকল কেন তোমাকে? নিশ্চয়ই অলক মিত্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধুও অনেক আছে। তাদেরই তো ডাকা উচিত!

কী যে বলিস তার ঠিক নেই। স্বামী মারা গেছে এখন তো স্বামীর বন্ধুদের কাছেই সান্ত্বনা খুঁজবে। একসময় তো বন্ধুত্ব ছিল, ডাকলে দোষ কী?

অলক মিত্র কবে মারা গেছে?

গত ফেব্রুয়ারি মাসে।

ফেব্রুয়ারি মাসে?

হ্যাঁ।

কী হয়েছিল?

ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। ওঃ, ফের এক জায়গায় ঘষছিস। এবার ডানধারটায় দে। সরু দাঁড়াগুলো দিয়ে দিচ্ছিস না তো? লাগছে কেন?

আচ্ছা, এবার ঠিক করে দিচ্ছি।

হ্যাঁ রে, ওরা যে রাঁধছে কোনও গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

এখন দুটো জিনিসই সেদ্ধ হচ্ছে। মশলা না পড়লে কি গন্ধ বেরোয়? রান্নাঘরে এগজস্ট ফ্যান চালানো আছে। গন্ধ বেরিয়ে যায়। বললে না?

আবার কী বলব? সবই তো বললাম।

বন্যা দেখতে কেমন?

মোটামুটি।

ফরসা?

মোটামুটি।

লম্বা?

কী জানি বাবা, মেয়েদের লম্বাটা অতটা বুঝি না। মাঝারি হাইট হবে হয়তো!

বুকের ভিতর ঢিবঢিব করছে। শব্দটা বাড়ছে। দ্রুত হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের গতি।

চোখ, নাক, মুখ?

ওই একরকম। কেন যে এত প্রশ্ন করছিস! তোকে আজ কীসে পেল?

আহা, তুমি বাড়ি এলে তো আমরা এরকমই বকবক করি। করি না বলো? প্রশ্ন করে করে তোমাকে ঝাঁঝরা করে দিই।

তা দিস।

তা হলে বিরক্ত হচ্ছ কেন?

আচ্ছা আচ্ছা, ঠোঁট ফোলাতে হবে না।

তুমি কি জান যে, তুমি আমাদের ওপর রাগ করলে আমাদের মন

ভীষণ খারাপ হয়ে যায়?

কী মুশকিল! রাগ করলাম কোথায়? চিরুনিটা রেখে এবার পিঠে হাত বুলিয়ে দে।

দাদা।

হুঁ।

তোমার ঠোঁটের ব্যথাটা কমেছে?

একটা শীতল স্রোত জ্ঞানের মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল। সে চমকে উঠেছিল। অবাক হয়ে বলল, ঠোঁটের ব্যথা?

বাঃ! ফিরে এসেই বললে না, বাসে হঠাৎ ব্রেক কষায় সামনের সিটে মুখ থুবড়ে পড়ায় ঠোঁটে ব্যথা লেগেছে। ঠোঁট ফুলে গিয়েছিল।

ও হ্যাঁ হ্যাঁ! এখন ঠিক আছে।

লজ্জায় চোখ তুলতে পারছিল না জ্ঞান। বালিশে মুখ আরও গভীরভাবে ডুবিয়ে দিল সে। মিথ্যাচার! এত মিথ্যাচার কি সে পারে? তার অভ্যাস নেই।

বন্যার আশ্লেষে ডুবে গিয়েছিল সে। ওর দাঁত কত গভীরে বসে গিয়েছিল তা তখন খেয়ালও করেনি। তখন স্বর্গের ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছিল। তখন সে মর্ত্যবাসী ছিল না অনেকক্ষণ। কিন্তু যখন মাটিতে পা রাখল, ফিরে এল স্বর্গ থেকে তখন দুটি ঠোঁটে প্রবল জ্বালা আর রক্তের লোনা স্বাদ। অনভ্যাসের চুম্বন। সারাক্ষণ রুমালে ঠোঁট ঢেকে বাড়ি ফিরেছিল সে। যখন ডোরবেল বাজিয়েছিল তখনও ঠোঁট পটলের মতো ফুলে আছে। বাসের ব্রেক কষার গল্পটা বলতেই হয়েছিল তাকে। মা তাড়াতাড়ি ফ্রিজ থেকে বরফ বের করে দিয়ে বলেছিল, শিগ্‌গির বরফ চেপে ধরে রাখ। বিষিয়ে গেলে মুশকিল।

ভুলেই গিয়েছিল জ্ঞান। মিথ্যে কথা মনে রাখা যায় না।

চা করবি না বিদ্যা?

এইমাত্র দেখে এলাম, সেদ্ধ নামেনি। দয়া বলেছে রান্নাটা নামলেই ও নিজে চা করে দিয়ে যাবে।

আর কী বলবে জ্ঞান? চুপ করে রইল।

দাদা, ঘুমোওনি তো?

না।

আজ দুপুরে কিন্তু তুমি একটুও ঘুমোওনি। আড়াইটায় শুয়েছ, চারটে অবধি এপাশ ওপাশ করেছ।

দুপুরে ঘুমোনোর তো অভ্যাস নেই। ওইসময় ক্লাস থাকে।

বাড়ি এলে দুপুরে কিন্তু ঘুমোও। আজ ঘুম হয়নি, না?

না।

বাবা যখন বাড়ি এল তখন তুমি বাড়িতে ছিলে না।

না!

তাই তোমাকে মা বলেনি।

কী বলেনি?

গত সোমবার আসানসোলের ঠিকানায় বাবা একটা চিঠি পায়। তোমার এক বন্ধুর লেখা।

কীসের চিঠি? কে বন্ধু?

তোমার এক বন্ধু তোমার ঠিকানা আর ফোন নম্বর চেয়ে বাবাকে চিঠি লিখেছিল।

জ্ঞান চুপ করে রইল। আজ বোধহয় তাকে পাতাল প্রবেশ করতে হবে।

জিজ্ঞেস করলে না কে?

কে বল তো!

তার নাম অলক মিত্র।

ও! বলে জ্ঞান তার সীমাবদ্ধ মাথার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য আরও মিথ্যে কথা খুঁজতে লাগল।

এই কি সেই অলক মিত্র যে ফেব্রুয়ারি মাসে মারা গেছে?

জ্ঞান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, চিঠিটা কোথায়?

চিঠি তো বাবা আমাকে দেয়নি। মায়ের হাতে দিয়ে বলল, খোকার এক বন্ধু ওর ঠিকানা চেয়ে চিঠি লিখেছে আমাকে। ওকে বোলো বন্ধুর সঙ্গে যেন যোগাযোগ করে। আমি অবশ্য ঠিকানা আর ফোন নম্বর জানিয়ে চিঠি লিখে দিয়েছি। মা চিঠিটা দেখে বলেছিল, ওমা, এ তো মেয়েলি হাতের লেখা!

দয়া চা নিয়ে এল।

কী হচ্ছে রে বিদ্যা? দাদাকে আজ একা দখল করে আছিস?

তার জন্য খাজনাও দিতে হচ্ছে।

পিঠ চুলকোনো? ফুঃ, ওটা আবার খাজনা। দাদাকে ঘুমোতে দিসনি তো?

আজ দাদা ঘুমোয়নি। এপাশ ওপাশ করছিল।

জ্ঞান চায়ের কাপের দিকে নিবিড় চোখে অথচ আনমনাভাবে চেয়েছিল। সে এরকম বাচ্চা ছেলের মতো ধরা পড়ে যাবে কখনও

ভাবেনি। কেন যে মিথ্যে কথাগুলো বানিয়ে বলতে গেল!

দয়া চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ জ্ঞান বিদ্যার দিকে তাকাতে পারল না।

ক্রমশ নিস্তব্ধতা অসহ্য হয়ে উঠছিল।

চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে দাদা।

ওঃ হ্যাঁ। বলে জ্ঞান উঠে বসে। চায়ের কাপ হাতে নেয়।

বিদ্যা খুব সস্নেহে তার পিঠে একটা নরম হাত রেখে বলল, তোমার হাত কাঁপছে। শরীর খারাপ?

জ্ঞান মাথা নেড়ে বলল, না।

তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাই।

কী কথা?

বলতে চাই যে, আমরা তোমাকে ভীষণ ভালবাসি।

ম্লান একটু হেসে জ্ঞান বলে, বাসিস?

ভীষণ। আমাদের ভুবন জুড়ে তুমি।

তাই?

জান না?

মাথা নেড়ে জ্ঞান বলে, জানি। জানব না কেন?

আমরা সবাই সবাইকে ভীষণ ভালবাসি। ইট ইজ এ ফ্যামিলি ইন লাভ উইথ ইটসেলফ। তাই না? বলো।

হ্যাঁ।

পিঠে বিদ্যার নরম একটা হাত ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই হাতও যেন কথা বলছে তার সঙ্গে। বিদ্যার হাত বলছে, ইউ আর নট এ গুড লায়ার।

গরম চায়ে চুমুক দিতেই ঠোঁটের ক্ষতস্থান যেন চেঁচিয়ে উঠল, স্টপ ইট।

সামনের দরজাটার দিকে শূন্য চোখে চেয়েছিল জ্ঞান। ওরা কি জানে? ওরা কি সব জানে?

দরজার ফ্রেমে হঠাৎ অপরূপ বিভঙ্গে এক নারীমূর্তি দেখা দিল। নিতান্তই কিশোরী সে। মস্ত এলো খোঁপা ভেঙে পড়েছে ঘাড়ের ওপর। কপালে মুক্তোর দানার মতো ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। ঘামে লেপটে আছে চূর্ণ চুল। মুখে একটা ঠোঁট-টেপা লাজুক হাসি। বিশাল দুটি চোখের পাতা নেমে আছে নীচে। তার হাতে ট্রে। ট্রের ওপর একটা প্লেট। তা থেকে ধোঁয়া উঠছে। একটা মিষ্টি রান্নার গন্ধে ভরে যাচ্ছে ঘরখানা।

মেয়েটা বলল, একটু টেস্ট করে দেখবেন?

হাত বাড়িয়ে সসংকোচে প্লেটটা নিল জ্ঞান। একটা ডাইভারশন। এটুকুর যেন হঠাৎ বড় দরকার ছিল।

ভীষণ গরম কিন্তু! সাবধানে খাবেন।

জ্ঞান বলল, বাঃ, খুব সুন্দর গন্ধ তো। কেন এই গরমে এত কষ্ট করে রাঁধতে গেলে?

কষ্ট! কষ্ট কেন হবে?

মস্ত আলুটার একটুখানি কেটে মুখে দিয়ে সে বলল, চমৎকার? তোমার রান্নার হাত তো খুব ভাল!

সতীর মুখে যেন হঠাৎ একটা আলো ফুটে উঠল।

নুন-ঝাল গরম আলু মুখে যেতেই তার বিক্ষত ঠোঁট ফের আর্তনাদ করে উঠল, কী হচ্ছে কী?

দয়া এসে সতীর পাশে দাঁড়িয়ে জ্ঞানের দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে বলল, দাদা!

উঃ?

তুমি রান্নার প্রশংসা করলে?

হ্যাঁ তো!

তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো?

কী হবে?

সতী সুন্দরী হতে পারে, তা বলে যে সুন্দরীদের কোনও দোষ থাকবে না তা তো নয়!

তটস্থ হয়ে জ্ঞান বলে, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!

কী করে খাচ্ছ দাদা?

কেন, সুন্দর হয়েছে তো!

কাঁদো কাঁদো মুখে সতী জ্ঞানের দিকে চেয়ে করুণ গলায় বলল, দেখুন না, ও বলছে রান্নায় নাকি নুন হয়নি।

দয়া জ্ঞানের দিকে চোখ পাকিয়ে চেয়ে বলল, হয়েছে নুন?

আমার তো আলুনি লাগছে না?

লাগছে না?

না তো!

অ্যান্ড দ্যাট ইজ শেমলেস পার্শিয়ালিটি।

জ্ঞান মৃদু হেসে বলে, কেন ওর পিছনে লাগছিস? নুন ঠিক আছে।

মোটেই ঠিক নেই।

নুন কম হলে আমি খাচ্ছি কী করে?

সুন্দর মুখের জন্য মানুষ কী না করতে পারে বলো। যুদ্ধ লাগায়, জাহাজ ডোবায়, সব ছারখার করে দেয়। করে না, বলো?

জ্ঞান একটু শিউরে উঠল।

তার পিঠে এখনও বিদ্যার নরম হাত কিছু খুঁজছে যেন। কী খুঁজছে? ডাঁশ? গোটা? নাকি তার অতীত? ভিতরকার পাপ, স্খলন, পতন? খুঁজছে। কিছু খুঁজছে।

চোখ নামিয়ে নিয়ে জ্ঞান বলে, চেঁচামেচির কী আছে? নুন যদি কমই হয়ে থাকে তা হলে একটু নুন দিয়ে নিলেই তো হয়।

তা হলে স্বীকার করলে তো যে, নুন হয়নি?

আমি তোদের মতো অত বুঝতে পারি না।

যার নুনের মাত্রাজ্ঞান নেই সে কিন্তু ভাল রাঁধুনি নয়।

তা কেন, টেস্ট তো খুব ভাল হয়েছে।

দয়া সতীর দিকে ফিরে বলল, দেখলি সতী, ঠিক বলেছিলাম কিনা।

সতী লাল হয়ে বলল, যা!

শেষ কথাটা বুঝল না জ্ঞান। কিন্তু ভারী সংকোচ বোধ করল।

রাত্রিবেলা অস্বস্তিকর ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে সে একটা প্রকাণ্ড মাঠ দেখতে পাচ্ছিল। মাঠটার এদিকে আলো, কিন্তু ওপাশটায় ভীষণ অন্ধকার। আর সেই মাঠের ওপর দিয়ে তার দুটি যমজ বোন দৌড়োচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে ওরা?

এই, তোরা কোথায় যাচ্ছিস?

ওরা জবাব দেয় না, ওরা ওপাশের ভীষণ ঘুটঘুট্টি অন্ধকারের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে।

বিদ্যা, দয়া! কোথায় যাচ্ছিস? হারিয়ে যাবি যে!

ওরা থমকে ফিরে তাকাল তার দিকে। অনেক দূর থেকে বলল, হারিয়ে যাব কেন? আমরা চলে যাচ্ছি।

কোথায় যাচ্ছিস তোরা?

যেখান থেকে এসেছিলাম। ওই অন্ধকারে!

কেন যাবি তোরা? খবরদার যাসনে, ওখানে ভীষণ অন্ধকার যে।

আমরা তো এখানকার লোক নই।

কোথাকার লোক?

অন্য জগতের।

তোদের ছাড়া আমি থাকব কী করে?

আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। তাই চলে যাচ্ছি।

ফিরে আয়! শিগ্‌গির ফিরে আয়।

কেন ফিরে আসব?

আমাদের কাছে আয়। হারিয়ে যাস না।

আমরা আমাদের জায়গায় ফিরে যাচ্ছি দাদা।

যাস নে, প্লিজ! কী চাস তোরা বল! সব দেব।

কী দেবে?

যা চাস সব।

দুজনে তার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, না, তুমি দেবে না।

সব দেব। ফিরে আয়।

মাথা নেড়ে দুই বোন একসঙ্গে বলে, তা হলে ওরকম করলে কেন?

কী করলাম?

কাঁদো কাঁদো মুখে দুই বোন বলল, কেন ওরকম করলে? কেন হারিয়ে গিয়েছিলে?

দুই বোন এক পা এক পা করে পিছনে সরে যাচ্ছে। আর পিছনের কয়লাখনির মতো নিরন্ধ্র অন্ধকারটাও এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

আর হারিয়ে যাব না। কথা দিচ্ছি, তোরা ফিরে আয়। আর যাস নে। অন্ধকারটা তোদের গিলে খাবে।

আমরা তো তাই চাই।

আদিগন্ত এক ভয়াল মাঠের ওপর দিয়ে প্রাণপণে ওদের দিকে ছুটতে লাগল জ্ঞান। কিন্তু এই বিশাল মাঠ সে কিছুতেই পেরোতে পারছে না। দৌড়োতে দৌড়োতে তার মনে হচ্ছে, কী ভীষণ ভারী তার দু'খানা পা, সে যেখানে আছে সেখানেই আছে, এক পাও এগোতে পারছে না।

জাগবার পর বুকটা ধক ধক করছিল তার। অনেকক্ষণ অন্ধকারে চুপচাপ বসে রইল সে।

তিনদিন পর ঝাড়গ্রাম থেকে বন্যাকে একটা চিঠি লিখেছিল সে। খুব সংক্ষিপ্ত চিঠি : তুমি বলেছিলে, বিরহ ভুলতে দেয় না, কিন্তু মিলন সব ভুলিয়ে দেয়। তোমাকে আমি ভুলতে দেব কেন বন্যা? এর বেশি আর কিছু বলার নেই আমার।

তীরন্দাজ

বড়ঠাকুরের পুজো বলে কথা, ইয়ার্কি নয়। কাঁচাখেগো দেবতা। একটু অনাচার হলে রক্ষে নেই।

সকালেই চান করেছে দীয়া। কাচা শাড়ি পরেছে। আটা, ময়দা, গুড়, বাতাসা আর কাঁঠালি কলা এনেছে সিন্নির জন্য। পুজোর ডালা সাজিয়েছে। একা হাতে সব। মা দু'বাড়িতে রান্না করে। তার সময় হয় না। আর বাবা সকালবেলায় বেরিয়ে যায় পচুবাবুর কারখানায় কাজ করতে। দুটো ভাইবোনকে সামলে, রান্না করে দীয়াকেই সব দিক সামাল দিতে হয়। এই পনেরো পেরিয়ে ষোলোতেই সে রীতিমতো পাকা সংসারী। সামনের বার তার মাধ্যমিক দেওয়ার কথা। পরীক্ষাটা দিতে পারবে কিনা কে জানে। পড়ার বই নিয়ে বসার সময়ই হয় না।

সবাই ডালায় নাম লেখা একটা কাগজ সেঁটে দেয়। দীয়া জানে শুধু নাম নয় গোত্রও লিখতে হয়। তার বাবা শিখিয়েছে। কিন্তু এই বস্তিবাসীদের বেশিরভাগই তাদের জাত-গোত্র ভাল করে জানেই না। শুধু পদবিটা জানে। এখানে পদবিও বেশি নয়, মণ্ডল, অধিকারী, দাস, সরকার আর রায়। শুধু এ তল্লাটে তারাই চক্রবর্তী। বামুন। কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র।

বামুন বলে এ পাড়ায় তাদ্দের অল্প একটু খাতির আছে। না, খুব বেশি যে মান্যগণ্য করে তা নয়। তবে ওই একটু-আধটু ভদ্রতা করে কেউ কেউ। আলতাবুড়ি একবার শিবরাত্রির দিন বাবার পাদোদক চেয়েছিল। তার বাবা অবশ্য ভয়ে আর সেটা দেয়নি।

এ পাড়ায় গলার জোর যার মুলুক তার। ঝগড়া না করলে এখানে টিকে থাকা খুব কঠিন। জলের কলে আগুপিছু নিয়ে ঝগড়া, বাচ্চাদের মারপিট নিয়ে ঝগড়া, মেয়ে ফুসলানো নিয়ে ঝগড়া, মদ খেয়ে ঝগড়া। সারাদিন ঝন ঝন করে কেবল ঝগড়া হয় আর সেইসব ঝগড়ায় দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ খারাপ কথা শোনা যায়। বাড়ির মামলায় হেরে গিয়ে তারা চার বছর আগে যখন এ পাড়ায় এল তখন এসব শুনে শিউরে উঠত। আজকাল গা-সওয়া হয়ে গেছে। এখানেই তো থাকতে হবে তাদের। দীয়া বা তার বাবা এখনও ঝগড়াঝাঁটি করতে পেরে ওঠে না। আসলে তাদের বাক্য ফুরিয়ে যায়। দীয়ার মা একটু-আধটু পারে, কিন্তু খারাপ গালাগাল এখনও দিতে জিবে

আটকায়। শুধু বুড়ু আর বিশু টপ করে শিখে গেছে। বুড়ুর বয়স মোটে বারো, এর মধ্যেই সে বেশ তেড়ে ঝগড়া করতে পারে। বিশুর বয়স আট। সে ততটা না হলেও দু-চারটে খারাপ কথা শিখেছে। লক্ষণটা ভাল নয় মোটেই।

দীয়ার মা আর বাবার মধ্যে খুব অশান্তি। দুজনে ঘরে থাকলেই লেগে যায় ভীষণ। দীয়ার মায়ের কথা একটাই, তুমি অপদার্থ বলে নিজেও শেষ হলে, আমাদেরও শেষ করলে।

দীয়ার বাবা পরেশনাথ যে অপদার্থ তাতে সন্দেহ নেই। লেখাপড়া খানিকদূর করেছিল, কিন্তু বি এসসি পাশ করার পর ভাল বা ভদ্রগোছের চাকরি জোটাতে পারেনি। অঙ্কে অনার্সও ছিল নাকি। দীয়ার জ্যাঠামশাই নরেশনাথ বেশ শাঁসালো মানুষ। তার ঠিকাদারির ব্যবসা। পরেশনাথ দাদার ব্যবসাতেই ছিল এতকাল, ভাল টাকাপয়সাও পেত। কিন্তু নরেশনাথের দুই ছেলে লায়েক হওয়ার পর পরেশনাথের ক্ষমতা কমল। তারপর ভাইপোরা মাঝে মাঝে অপমানসূচক কথা বা ধমক চমকও শুরু করায় পরেশনাথের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হয়নি। ভাইকে কিন্তু ভালবাসত নরেশনাথ। কসবায় একটা ছোট বাড়ি ছিল তার, সেটার একটা অংশ লিখেও দিয়েছিল ছোট ভাইকে। কিন্তু ভাইপোরা সেই দানপত্র মানেনি। মামলা করে এবং টাকাপয়সা ছড়িয়ে দানপত্র জাল প্রমাণ করে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে দেয় পরেশনাথকে।

নরেশনাথেরও কিছু করার ছিল না। সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়ে পক্ষাঘাত। এখন শয্যাশায়ী।

পচুবাবুর কারখানাটা কীসের তা অবশ্য দীয়া জানে না। শুধু জানে, বাবা সেখানে উদয়াস্ত খাটে এবং বারোশো টাকা মাইনে পায়। আর ওই বারোশো টাকাই নাকি ওখানকার সবচেয়ে বেশি মাইনে। আরও জনা পনেরো লোক আছে সেখানে, তারা আরও কম টাকা পায়।

আজকাল হিসেবটিসেব শেখার পর দীয়া বুঝতে পারে এ বাজারে বারোশো টাকা খুব কম টাকা। মা আরও আটশো টাকা আনে বলে কষ্টেসৃষ্টে তাদের চলে যায়।

এই বস্তির একজন মালিক ছিল। আগে লোকটা দারোয়ান সঙ্গে নিয়ে ভাড়া আদায় করতে আসত। বছর দুয়েক আগে হঠাৎ বস্তি আর পার্টির লোকেরা মিলে লোকটাকে এমন তাড়া লাগাল যে, বেচারা আর এমুখো হয় না ভয়ে। একটা মামলা ঠুকে বসে আছে। বস্তির কেউ ভাড়া দেয় না বটে, কিন্তু পার্টির চাঁদা দিতে হয়। সেটা নাকি ভাড়ার চাইতে কিছু বেশিই।

মাঝে মাঝে শোনা যায়, কোন প্রোমোটার নাকি এখানকার বস্তি তুলে দিয়ে মাল্টিস্টোরিড করবে। তার জন্য পার্টির সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। কী যে হবে তা দীয়া জানে না। তবে তারা বেশ ভয়ে ভয়ে থাকে। এ পাড়ার পার্টিই মা-বাপ।

দীয়া যখন এখানে প্রথম আসে তখন তার বয়স এগারো-বারো। ঘরদোর আর চারদিকের অবস্থা দেখে খুব মন খারাপ। তখন সে প্রায়ই কল্পনা করত, জ্যাঠামশাই একদিন ভাল হয়ে যাবে, তারপর এসে হাজির হবে তাদের ফের কসবার বাড়িতে ফেরত নিয়ে যেতে। জ্যাঠামশাই তাদের বড্ড ভালবাসত।

কিন্তু আজ দীয়া বুঝতে পারে, ওরকম কিছু আর ঘটবে না। জ্যাঠামশাই এখনও বেঁচে আছে বটে, কিন্তু সেই আগের মানুষটা তো আর নেই।

ওই যে 'ফিরে যাব, ফিরে যাব' বলে মনে হত ওর জন্যই দীয়া কখনও এই বস্তির মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি। তার মা-বাবাও কেমন যেন এখানে একটু সিটিয়ে থাকে। শুধু বুড়ু আর বিশুর কথা বলা যায় না। ওরা তো ছোট থাকতেই এসেছিল। ওরা যেন বেশ মানিয়ে নিতে পেরেছে। এইটেই একটু চিন্তারও বিষয়।

গায়ে গায়ে ঘর, এ ঘরের কথা ও ঘর থেকে শোনা যায়। সেও এক ভীষণ অস্বস্তি। আর এমন অদ্ভুত, মা-বাবা ছেলে আর ছেলের বউ একই ঘরে থাকে, যেমন মহাদেব দাসেরা আছে। কী করে যে থাকে কে জানে বাবা। দীয়া আজকাল বড় হয়েছে। বুঝতে পারে। ভাবলেই কেমন লজ্জা করে তার। মহাদেব দাসের বাড়ির কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। কিন্তু, ছেলের বউ শেফালী একদিন বলেছিল, ঘরের মাঝখানে নাকি পরদা ফেলে দেয় রাতে। এখানে কেউ কিছু গায়ে মাখে না।

দু-চার ঘর এখনও আছে যারা আর সকলের মতো নয়। অনেকটা তাদের মতোই, একটু আলাদা রকমের। পিছনের গলির মদন ঘোষ যেমন। পলিটিক্যাল সায়েন্সে এম এ, একটা ইস্কুলে পড়ায়ও। তাদের হাবভাব একটু অন্য রকমের। ভদ্রলোক গরিব অবস্থায় বস্তিতে ঘর নিয়েছিলেন। এখন অবস্থা সচ্ছল হলেও অন্য কোথাও যাননি। বোধহয় একটু কৃপণও আছেন। তাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে যায় দীয়া। মাসিমা বেশ ভাল মানুষ, সাতে-পাঁচে নেই। বস্তি হলেও অনেকের ঘরে রঙিন টিভি, পাখা, প্রেশার কুকার, কারও কারও ঘরে ফ্রিজ অবধি আছে। পয়সা হলেই সবাই ওসব কেনে। দীয়াদের অবশ্য কিছু নেই, একটা টেবিল ফ্যান ছাড়া।

পুজোটা করছে গলির মুখের শীতলা ক্লাব। এবার নাকি পঞ্চাশ হাজার

টাকা বাজেট। তাদের কাছ থেকেও পনেরো টাকা চাঁদা আদায় করেছে। বেশ জমকালো আয়োজনই করেছে কিন্তু। ওপরে চাঁদোয়া, ঝাড়লণ্ঠন। পুজো দেখার জন্য সার সার লোহার চেয়ার পাতা। মাইকে হিন্দি গান চলছে অহরহ। নীল রঙের বড়ঠাকুরের মূর্তিখানাও বেশ বড়সড়। দু'দিন যাত্রা আর ফাংশন হবে। একদিন বালভোজন। সকাল থেকে রাজ্যের বাচ্চাকাচ্চা জড়ো হয়ে সেখানে হল্লাগুল্লা করছে। বুড়ু আর বিশুরও উসখুস ভাব। দীয়া চোখ রাঙিয়ে পড়ায় বসিয়ে রেখেছে।

ছোট ঘর তাদের। মেঝেটা পাকা, দেয়ালে খানিকটা ইটের গাঁথনি আছে, তার ওপরে বাঁশের বেড়া, ওপরে টালি। ঘরের একধারে বেড়া দেওয়া একটুখানি রান্নাঘর। রান্নাঘরে বসে একটা স্টিলের বড় বাটিতে সিন্নি মাখছিল দীয়া। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে নিয়েছে, যাতে কথা বলতে গেলে থুথু না ছিটকে যায়। বড়ঠাকুর বলে কথা, একটু অনাচার হলে রক্ষে আছে?

না, অনাচার কিছু হয়নি তার। স্নান করেছে, বার বার হাত ধুয়েছে, পরনে কাচা কাপড়।

ও ঘর থেকে বিশু বলল, আর কত মাখবি দিদি? যা না নিয়ে ডালাটা। কখন থেকে সিন্নি খাব বলে বসে আছি!

ইস! দিল লোভ লাগিয়ে! ইচ্ছে করে গিয়ে চটাং করে একটা চড় বসায় গালে। কিন্তু ঠাকুরদেবতার কাজের সময় রাগটাগ করতে নেই। ওতে অমঙ্গল।

পিছনের জানালা দিয়ে একটু আবছা আলো আসছিল। তাতে হঠাৎ একটা ছায়া পড়ল।

এই দীয়া, কী করছিস?

দীয়া শুধু মুখ বুজে বলল, উহুঁ।

অর্থাৎ কথা কইবে না।

যমুনা বলল, সিন্নি মাখছিস?

হুঁ।

আমাদের ডালার নম্বর দুশো বারো। আর দেরি করলে অনেক পিছনে পড়ে যাবি।

সিন্নির বাটিটা একটা পরিষ্কার স্টিলের প্লেটে ঢাকা দিয়ে গামলার জলে খাবল খাবল করে হাত ধুয়ে পিছন ফিরে যমুনার দিকে তাকায় সে। তার বয়সি মেয়ে। বন্ধু। কারও সঙ্গেই গলাগলি নেই দীয়ার। ঝগড়া লাগলে যমুনার মুখ দিয়ে যা সব অসভ্য কথা বেরোয় কান পাতা যায় না। তাই এসব মেয়েকে দীয়া খুব সমঝে চলে। এমনিতে যখন ভাল তখন ভালই।

কিন্তু খেপলে সর্বনাশী।

দীয়া বলল, সব করতে হল তো সকাল থেকে তাই দেরি হল।

ওঃ, তুই যা কাজ করিস। এত খাটিস কী করে? আমি বাবা অত খাটুনি পারি না।

গতবার যমুনা জটাকে নিয়ে কালীঘাটে বিয়ে করে এল। মাথাভর্তি সিঁদুর, হাতে শাঁখা, মুখে খুব হাসি। তার মা-বাবাও ব্যাপারটা দেখল, একটু বকাঝকা করল। বেশি গা ঘামাল না। জটার ইলেকট্রিকের দোকান আছে। দোকান বলতে ফ্যান্সি স্টোর্সের পাশের দেয়ালে লাগানো একটা টিনের বাক্স। তাতে জটার যন্ত্রপাতি থাকে। তাতে জিনিসপত্র কিছু পাওয়া যায় না। জটা আসলে রোজগার করে মিস্ত্রি হিসেবে। কালো, ট্যারা, বেঁটে, রোগা জটা রাতে মদটদ খেয়ে এসে রোজ পেটাত যমুনাকে। যমুনাও উলটে মারত। ছ'মাস বাদে ছাড়াছাড়ি হয়ে যমুনা আবার কুমারী সেজেছে। তা এখানে এমন ধারাই হয়। বিয়ে হচ্ছে, ভাঙছে, আবার হচ্ছে। দীয়াব একটু গা ঘিন ঘিন করে। তার একটু সতীত্বের শুচিবায়ু আছে।

যমুনা বলে, কাল রাতে মাইরি ঘুমোইনি জানিস। শচীদা বলল, অ্যাই সারারাত প্যান্ডেল পাহারা দিবি তোরা। ব্যস, আমি, সরস্বতী, বিজুয়া, কালী আর দিনু রাত জেগে গল্প করলাম।

দীয়া বলল, সারারাত?

ভোরবেলা সব বসে বসেই ঘুমে ঢলাঢল। সমীর, কাশী, পঞ্চারা সব মদ খাচ্ছিল জানিস? আর তিন তাস।

দীয়া জানে। ওদের কেউ বাচ্চাদের স্কুলের ভ্যানগাড়ি চালায়, কেউ বা কলের মিস্ত্রি, কেউ দর্জির দোকানের শিক্ষানবিশ।

তোর সেই কার্তিকও ছিল।

দীয়া গম্ভীর হয়ে বলে, কার্তিক আমার হতে যাবে কেন?

আহা, তোকে তো লাইন দেয় বাবা।

ও পাজি ছেলে।

তোর কাছে তো সবাই পাজি। কার্তিক কমলকানন বাড়ির দারোয়ান, মনে রাখিস।

তাতে কী হল?

তাতে কী হল তা অবশ্য যমুনা ঠিক জানে না। শুনেছে কার্তিক হাজার টাকা মাইনে পায়। আর দেখতে গোবিন্দার মতো। কার্তিকের দিকে এ পাড়ার অনেক মেয়ের নজর আছে।

দীয়া বড্ড জ্বালাতন হয় কার্তিকের জন্য। ইস্কুলের রাস্তায় মাঝে মাঝেই

কার্তিক তার সঙ্গ ধরে কিছুক্ষণ কথাটথা বলে। ফালতু কথাই। কিন্তু ওইসব কথার আবডালে আবডালে অন্য কথার ইঙ্গিত থাকে। দীয়া বোঝে, কিন্তু ভয়ে কিছুতেই বলতে পারে না যে, তোমাকে আমার পছন্দ হয় না বাপু, কেটে পড়ো।

যমুনা বলে, কার্তিকের জন্য কত মেয়ে পাগল! তুই কী রে?

আমার ভাল লাগে না ভাই।

মা কী বলে জানিস? বলে বামুনরা নাকি বোকা হয়।

দীয়া একটু হাসল। বলল, বোকাই ভাল।

দীয়া ডালা সাজিয়ে উঠে পড়ল।

যমুনা বলল, আমি প্যান্ডেলেই যাচ্ছি। তুই আয়।

বেরোনোর মুখে বুড়ু আর বিশু করুণ মুখে বলে, আমরাও তোর সঙ্গে একটু যাই না দিদি!

দীয়া ধমক দিয়ে বলে, কটা বাজে? মোটে সাড়ে আটটা। এখনও আধঘণ্টা পড়ার কথা। তারপর ইস্কুল আছে।

বুড়ু কাঁচুমাচু হয়ে বলে, একটুখানি যাব আর আসব।

বিশু বলে, ডালা কখন ফেরত দেবে রে দিদি?

দীয়া কারও কথার জবাব দিল না। মাঝে মাঝে গম্ভীর না থাকলে ওরা ভয় পাবে না। বলতে কী, মা-বাবার চেয়েও বুড়ু বিশু দীয়াকেই বেশি ভয় পায়।

প্যান্ডেলে পাড়ার যুবাপুরুষদের জটলা চলছে। অন্তত পঞ্চাশটা বাচ্চার চেঁচামেচি, মাইকের গান।

ডালাটা দিয়ে একটু দাঁড়াল দীয়া। হাতজোড় করে বড়ঠাকুরকে প্রণাম করল। তার মন থেকে আজ কোনও প্রার্থনা উঠে এল না। শুধু বিড়বিড় করে বলল, সবাইকে ভাল রেখো ঠাকুর।

তার দিকে অনেকেই তাকায় আজকাল। না, সে তেমন সুন্দরী টুন্দরি নয়। তবে তাকানোর জন্য সুন্দরের দরকার হয় না। মেয়েছেলে হলেই হল। সে ছ্যাবলা নয় বলেই ছোকরারা তাকে একটু দেখে। মাপে। নিজেদের মধ্যে কথাও কয় ওরা। দীয়া টের পায়।

একটা লোক ছিল বুলুদা। বুলুদার মতো আর কাউকে দেখেনি সে। একবার শিবরাত্রি উপোসের পর বুলুদার নামে সে শিবের মাথায় জল ঢেলেছিল। সেকথা ভাবলে আজও তার গা শিরশির করে। কিন্তু বুলুদা যে কোথায় চলে গেল তা কে জানে!

তেমাথায় পুজো। একধারে রাস্তা, রাস্তা থেকে একটা গলি ঢুকেছে।

কানা গলিটার শেষে 'ঋদ্ধি' নামে নতুন একটা বাড়ি উঠেছে। সাততলা। এ বাড়িতে লিফ্‌ট আছে। অনেক ফ্ল্যাট। সব ফ্ল্যাটে এখনও লোক আসেনি। 'ঋদ্ধি'-র ফটকের কাছে পাড়ার ছুঁড়িরা আড্ডা দিচ্ছে।

ছায়া ডাকল, অ্যাই দীয়া!

কী বলছিস?

আজ ইস্কুলে যাবি?

হ্যাঁ।

যাঃ, আজ বড়ঠাকুরের পুজো, আজ কেউ ইস্কুলে যায়? আয় না, গল্প করি।

না রে, আজ সময় নেই। গিয়ে রাঁধতে হবে।

তোর কেবল কাজ আর কাজ। কী এমন হাতিঘোড়া রান্না বাবা!

দীয়া হাসল, বলল, বুড়ু বিশু ইস্কুলে যাবে, একদম সময় নেই।

'ঋদ্ধি'-তে একটা খুব খচ্চর লোক এসেছে জানিস? চাঁদা নিয়ে সকালে খুব ঝামেলা হয়েছে। গদাই, পঞ্চারা বলেছে লোকটাকে আজ ধোলাই দেবে।

দীয়ার এসব কথা শোনার সময় নেই। সে নিস্পৃহভাবে শুনল। বলল, আজ আসি।

পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গল্প করার কোনও লোভ হয় না দীয়ার। ওরা কেমন যেন একটু অদ্ভুত ভাষায় কথা বলে। আর যা সব বলে তা শোনার মতো নয়। বেশিরভাগই ছেলেছোকরাদের কথা আর এ বাড়ি ও বাড়ির মেয়েবউদের কেচ্ছা কাহিনী। এ পাড়ায় কেচ্ছার কোনও অভাব নেই।

অ্যাই দীয়া, আয় না!

দোনোমোনো করেও দীয়া এগোয়। এদের সে চটাতে চায় না। ছায়া ভীষণ মুখরা মেয়ে, যা খুশি তাই বলে দেয় লোককে। কিন্তু মনটা বেশ সাদা, হাসিখুশি। দীয়া একটু দাঁড়াল ওদের কাছে। বস্তির খানিকটা উচ্ছেদ করে এই বাড়িটা উঠল। যারা ছিল তারা সব ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা করে পেয়ে পার্টির আদেশে উঠে গেল। ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকায় এ বাজারে কিছুই হয় না। কিন্তু পার্টির কথা না শুনলে তো হবে না। জনশ্রুতি, পার্টি অন্তত দশ লাখ টাকা প্রোমোটারের কাছ থেকে পেয়েছে। পার্টির মাথা হল সাধু মণ্ডল, গিরীন দাস, ঝাঁপু পোদ্দার, হাতকাটা স্বপন। এরাই বেশিরভাগ টাকা খেয়েছে। কিন্তু সে কথা বলার সাহস কার আছে? খুন করে পুঁতে ফেলবে।

লোকটার নাম সমরেশ ভট্‌চায।

অবাক হয়ে দীয়া বলে, কার কথা বলছিস?

ওই যে খচ্চর লোকটা। পরশুদিন এসেছে।

ও। বলে দীয়া ফের নিস্পৃহ হয়ে গেল।

মোড় থেকে একটা ঠেলাগাড়ি ঢুকছে। বারের পুজোর প্যান্ডেল চেয়ার বেঞ্চ, ভিড় ঠেলে ঢুকতে পারছে না কিছুতেই। তবে পাড়ার ছেলেরা হইহই করে সব সরিয়ে টরিয়ে দিতে লাগল। ঠেলার ওপর ডাইঁ জিনিস।

হেনা বলে, ওই আর একটা এল।

'ঋদ্ধি'-তে লোক আসছে। ভাল ভাল লোক। ভদ্রলোক। এরা আসছে আর বস্তি উঠে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। কী যে কপালে আছে তাদের কে জানে!

পিছনে আরও একটা ঠেলা, তার পিছনে আরও একটা। ফ্রিজ, আলমারি, সোফাসেট, টিভি, খাট, ডাইনিং টেবিল কত কী!

দীয়া চেয়ে থাকে।

॥ দুই ॥

আপনার নাম সুমিত ঘোষাল?

হ্যাঁ।

কী করেন?

ট্যাক্সি চালাই।

গাড়ি কি নিজের?

হ্যাঁ।

নিজেই কিনেছেন?

না। আমার বাবার গাড়ি। আগে প্রাইভেট কার ছিল।

কবে থেকে ট্যাক্সি হয়েছে?

চার বছর।

আপনাদের অবস্থা ভালই ছিল তা হলে?

মোটামুটি।

বাঙালির গাড়ি থাকলে তো বড়লোক।

না, সেরকম বড়লোক আমরা ছিলাম না।

তা হলে কীরকম?

বাবা একটা ভাল চাকরি করতেন। অ্যালকেলি কেমিক্যালসে। শখ করে গাড়ি কিনেছিলেন।

বাবা বেঁচে আছেন?

না। বছর পাঁচেক হল মারা গেছেন।

তাঁর টাকাগুলো কী হল?

বাবার কিছু নেশা ছিল।

মদ?

হ্যাঁ। তা ছাড়া রেস, জুয়া এসব নেশাও।

তাইতেই কি সব উড়ে গেল?

কিছুটা। রিটায়ার করার পর একটা ব্যবসা করতে গিয়ে আরও সব চলে গেল।

কত টাকা লস হয়েছে মনে হয়?

দশ-বারো লাখ তো হবেই।

তারপর?

তারপর আর কী!

বাড়ি আছে?

বাবা সন্তোষপুরে একটা বাড়ি করেছিলেন। সেটা বিক্রি হয়ে যায়।

বিক্রি হল কেন?

বাবা মারা যাওয়ার পর আমার মায়ের ক্যান্সার ধরা পড়ে।

তারপর?

মায়ের চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা দরকার ছিল।

মা কি বেঁচে আছেন?

না। দু'বছর বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলাম।

বিয়ে করেছেন?

না। ওসব ভাবতেও ভয় করে।

আপনি কি তা হলে ভাড়াবাড়িতে থাকেন?

ঠিক তাও নয়। আমি একজনের ফ্ল্যাটের সারভেন্টস কোয়ার্টারে থাকি। ভাড়া লাগে না।

আপনার স্টেটমেন্টে দেখছি, ভদ্রলোকের নাম অজয় সেন। ঠিক তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বন্দোবস্তটা কীরকম?

উনি দুবাইতে থাকেন। আমি ওঁর ফ্ল্যাটটা দেখাশোনা করি।

ফ্ল্যাটের দেখাশোনা আবার কীসের? ফ্ল্যাট তো তালাবন্ধ থাকলেই হল।

তালাবন্ধ থাকলে একটু ড্যাম্প হয়ে যায়। ধুলোবালিও জমে। আমার কাজ হল সপ্তাহে অন্তত একবার ফ্ল্যাটটা খুলে ঝাড়পোঁছ করানো আর জানালা দরজা খুলে বদ্ধ বাতাস বের করে দেওয়া।

মজার কাজ তো।

ওঁর একটা গাড়িও আছে। রোজ সেটাতে কিছুক্ষণ স্টার্ট দিয়ে ইঞ্জিনটা অর্ডারে রাখি। কখনও সখনও চক্কর খাওয়াতে হয়।

অজয় সেনের বউ-বাচ্চা নেই?

আছেন। তাঁরাও দুবাইয়ে থাকেন।

আপনার সঙ্গে কীভাবে ভদ্রলোকের পরিচয়?

উনি একবার এয়ারপোর্ট থেকে আমার ট্যাক্সিতে ফিরছিলেন। সঙ্গে অনেক মালপত্র ছিল। তখন পরিচয়।

সওয়ারি আর ট্যাক্সিওলার পরিচয় কি এত সহজে হয়, যাতে তাকে নিজের ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকার করা যায়?

উনি অনেক মালপত্র এনেছিলেন বিদেশ থেকে। লাগেজ বুট থেকে সেসব নামাতে গিয়ে উনি একটা ব্রিফকেস ভুল করে ট্যাক্সিতে রেখে নেমে যান। ব্রিফকেসটা সিটের পিছনে রাখা ছিল। আমি ওঁকে ছেড়ে চলে

আসবার সময় হঠাৎ ব্যাক ভিউ মিররে ব্রিফকেসটা দেখতে পেয়ে ফিরে গিয়ে ওটা ওঁকে ফেরত দিই। উনি খুশি হয়ে বকশিশ দিতে চান। আমি নিইনি। সেই থেকে একটু পরিচয় হয়ে যায়।

পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা কী করে হল?

উনি আমাকে এক মাসের জন্য বুক করেন। কলকাতায় ওঁর ঘোরাফেরার কাজ ছিল।

কিন্তু ওঁর তো নিজের গাড়িও আছে বলছেন।

হ্যাঁ। কিন্তু উনি নিজে গাড়ি চালাতে পছন্দ করেন না।

কেন?

ওঁকে নানারকম চিন্তাভাবনায় কনসেন্ট্রেট করতে হয় বলে।

ড্রাইভার রাখতে পারেন তো!

হ্যাঁ। কিন্তু উনি দেশে খুব কম আসেন। এলেও পনেরো-কুড়ি দিনের জন্য। অত অল্প সময়ের জন্য ড্রাইভার রাখার অসুবিধে। উনি গাড়ি ভাড়া নিতেন। আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় উনি গাড়ির বদলে আমার ট্যাক্সিটা ভাড়া নিয়েছিলেন।

আপনি তা হলে একজন সৎ মানুষ, কী বলেন?

মোটামুটি।

আপনি মদ খান?

না।

কেন খান না? আপনার বাবা তো খেতেন!

বাবা খেতেন বলেই খাই না। মদ্যপানকে ছেলেবেলা থেকেই ভয় পাই।

রেস বা জুয়ো খেলেন কি?

না।

বাবার কোনও গুণই পাননি তা হলে?

না। ওগুলো বাবার গুণ নয়, দোষ।

অজয় সেন দুবাইতে কী করেন?

চাকরি প্লাস ব্যবসা।

কীসের ব্যবসা?

কনস্ট্রাকশনের। উনি একজন ইঞ্জিনিয়ার।

আপনি ওঁর ফ্ল্যাটেই থাকেন তো?

না। বলেছি তো, আমি থাকি একই ফ্লোরের একধারে চাকরদের জন্য যে ঘর আছে সেই ঘরে।

আর কেউ থাকে আপনার ঘরে?

না। আমি একা।

আপনার কি মনে হচ্ছে আমি আপনাকে ইররেলেভেন্ট প্রশ্ন করছি?

হচ্ছে। কারণ ঘটনার সঙ্গে তো এসবের যোগাযোগ নেই।

অ্যাপারেন্টলি নেই। কিন্তু আপনাকে এসব অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করার দুটো উদ্দেশ্য আছে। শুনবেন?

যদি দয়া করে বলেন, শুনব।

এক হল আপনার পুরো প্রোফাইলটা জানা। আর দ্বিতীয় কারণ হল, এসব অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কেউ কেউ বেফাঁস কথা বলে ফেলে।

আমি বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছি?

সেটা পরে ক্রস চেক করা যাবে। অজয় সেনের বয়স কত?

চল্লিশ-বিয়াল্লিশ।

কেমন লোক?

ভাল লোক। দিলদরিয়া।

উনি ব্ল্যাকমানিগুলো কোথায় রাখেন?

ওসব জানি না।

জেনে অবশ্য আমাদেরও লাভ নেই। কলকাতায় এই ফ্ল্যাটটা ছাড়া ওঁর আর কোনও প্রপার্টি আছে?

পার্ক সার্কাসে একটা বাড়ি আছে। কম্প্যানিকে ভাড়া দিয়েছেন।

আর কিছু?

আর কিছু জানি না।

কোন কোন ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে জানেন?

তিন-চারটে ব্যাঙ্কে।

চেনেন সেগুলো?

চিনি। আমিই তো ওঁকে ব্যাঙ্কে নিয়ে যাই।

এবার ঘটনাটার কথায় আসা যাক। কবে ঘটনাটা ঘটেছিল?

এ বছর সতেরোই জুলাই।

বলুন।

রাত নটা নাগাদ সিঁথির কাছে ওঁরা আমার ট্যাক্সিতে ওঠেন।

ক' জন?

মোট তিন জন। একজন এক মহিলা, দু'জন পুরুষ।

আপনি তাঁদের দেখলে চিনবেন?

বলতে পারি না। সতেরোই জুলাই রাত নটায় প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল।

আমার সওয়ারি নেওয়ার ইচ্ছে ছিল না।

তবে নিলেন কেন?

ওঁরা গড়িয়াহাট যাবেন বলেছিলেন। আমার গ্যারেজ ও দিকেই।

কোথায়?

গরচায়।

পুরুষ দু'জনের বিবরণ দিন।

একজন বুড়ো মানুষ, অন্যজন মাঝবয়সি হবে।

এঁদের মধ্যে কে আপনার সঙ্গে কথা বলেছিলেন?

মাঝবয়সি মানুষটি।

গলার স্বরটা কেমন?

একটু ভারী গলা। হাস্কি। তখন বৃষ্টি পড়ছিল, পরিষ্কার বুঝতে পারিনি।

পোশাক মনে আছে?

প্যান্ট শার্ট।

কী রঙের শার্ট?

বুঝতে পারিনি। সাদাটে হতে পারে।

আন্দাজে বলছেন না তো!

আন্দাজ করেই বলছি। রাস্তায় তেমন আলো ছিল না। তা ছাড়া ওদের তিনজনের মাথাতেই ছাতা ছিল। বুঝতেই পারছেন, জামার রং বুঝতে পারার মতো অবস্থা ছিল না।

মেয়েটিকে লক্ষ করেছিলেন?

না। মহিলা এবং বুড়ো মানুষটি পিছনের দিকে ছিলেন।

মেয়েটি সম্পর্কে কিছুই জানেন না?

শুধু বলতে পারি মাথায় ঘোমটা ছিল।

শাড়ির রং?

না।

মোটাসোটা না রোগা?

রোগা।

এই তো লক্ষ করেছেন। কীরকম রোগা?

ছিপছিপে।

বয়স?

বলা খুব শক্ত। তবে অল্প বয়স বলেই মনে হয়েছিল।

মাঝবয়সি লোকটার মুখ নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছিলেন! উনি আপনার সঙ্গে কথা বলেছেন।

হ্যাঁ। কিন্তু ছাতায় ঢাকা মুখ, অন্ধকারে আর কতটা বোঝা যাবে?

তবু যেটুকু দেখেছেন তার বিবরণ দিন।

লোকটার গোঁফ ছিল। বেশ মোটা গোঁফ।

কার মতো গোঁফ? স্যর আশুতোষের মতো, না স্ট্যালিনের মতো, না হিটলারের মতো?

স্যর আশুতোষের মতো।

মুখটা গোল না লম্বাটে?

লম্বাটে, তবে খুব বেশি লম্বাটে বোধহয় নয়।

চোখ দেখেছেন?

ওই অন্ধকারে যতটুকু দেখা যায়।

তারপর বলুন।

ওঁরা গড়িয়াহাটে আসবেন শুনে আমি ওঁদের তুলে নিই।

ইলাবোরেট করে বলুন। গাড়িতে কে প্রথম ঢোকেন?

বুড়ো মানুষটি। তারপর মাঝবয়সি ভদ্রলোক, সবার শেষে মেয়েটি।

ঠিক মনে আছে?

হ্যাঁ। পিছনের দরজা লক করা ছিল। আমি পিছন ফিরে লক খুলে দেওয়ার সময় ওদের পর পর উঠতে দেখেছিলাম।

গাড়ির ভিতরকার আলো জ্বেলেছিলেন?

না। দরকার হয়নি।

তারপর বলুন।

ওঁরা উঠে বসলেন। আমি গাড়ি স্টার্ট দিলাম।

আপনি পুলিশের কাছে স্টেটমেন্টে বলেছেন, বুড়ো মানুষটির হাতে ছাতা ছাড়াও একটা ব্যাগ ছিল।

হ্যাঁ।

কীরকম ব্যাগ?

পোর্টফোলিয়ো ব্যাগ বলেই মনে হয়েছিল।

ব্রিফকেস নয়?

না।

আন্দাজে বলছেন না তো!

একটু সন্দেহ তো আছেই। কিন্তু ব্রিফকেস বলে মনে হয়নি।

আর কারও হাতে কিছু ছিল?

হ্যাঁ। তাও পুলিশকে বলেছি। ভদ্রমহিলার কাঁধ থেকে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলছিল।

কীরকম ব্যাগ?

বেশ বড়সড়। আজকাল ওয়ার্কিং গার্লরা যেমন বড় ব্যাগ ব্যবহার করে।

মাঝবয়সির হাতে কী ছিল?

শুধু ছাতা।

আর কিছু নয়? ভাল করে মনে করে দেখুন।

না। আর কিছু নয়।

পিছনের দরজার কাচ কি বন্ধ ছিল?

হ্যাঁ। ছাঁট আসছিল বলে বন্ধ ছিল। শুধু ড্রাইভারের ডানধারের জানালাটা একটু ফাঁক করা ছিল।

ওঁরা কি গাড়িতে বসে কোনও কথা বলছিলেন?

না।

একটাও কথা নয়?

বললেও আমি কিছু শুনিনি। রাস্তায় জ্যাম ছিল, সব গাড়ি হর্ন বাজাচ্ছিল, বাইরে তুমুল বৃষ্টি আর বাতাস, কিছু শোনার উপায় ছিল না।

ওঁরা কি চুপচাপ বসে ছিলেন স্থির হয়ে?

ওঁদের দিকে নজর দেওয়ার সময় ছিল না। জ্যাম কাটিয়ে বেরোনোর জন্য আমি তখন ফাঁকফোঁকর খুঁজছি। সওয়ারি খুব টেঁটিয়া না হলে বেশিরভাগ সময়েই ট্যাক্সিওয়ালারা ওদের দিকে খেয়াল করে না।

সুন্দরী মেয়েছেলে হলে করে তো!

হ্যাঁ, তা হতে পারে।

মহিলাটির বয়স সম্পর্কে কিছু আন্দাজ করতে পারেন?

না। তবে বয়স বেশি নয় বলেই মনে হয়েছিল।

অন্ধকারে ওরা তা হলে চুপচাপ বসেছিলেন?

হ্যাঁ।

কে প্রথম নামেন?

ভদ্রমহিলা।

কোথায়?

পার্ক সার্কাস।

আপনি সোজা সার্কুলার রোড ধরে পার্ক সার্কাসে এলেন?

হ্যাঁ।

কেউ আপনাকে ওই রুটে আসতে বলেছিল নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ। গাড়িতে উঠেই মাঝবয়সি লোকটি শুধু বলেছিলেন, পার্ক সার্কাস হয়ে যাবেন।

আর কেউ কিছু বলেনি?

না।

কিন্তু জ্যাম আর বৃষ্টিতে সিঁথি থেকে এতটা পথ আসতে নিশ্চয়ই অনেক সময় লেগেছিল?

হ্যাঁ। দেড় ঘণ্টার ওপরে।

এতক্ষণ ওঁরা চুপচাপ বসে ছিলেন?

হ্যাঁ।

ব্যাপারটা আপনার অস্বাভাবিক মনে হয়নি?

না। বললাম তো, আমি ওদের খেয়াল করিনি। রাস্তায় জল জমে গিয়েছিল। কোথায় ফেঁসে যাই সেই চিন্তাতেই বেশ টেনশনে ছিলাম। কলকাতার রাস্তাঘাট তো জানেন।

পার্ক সার্কাসে ভদ্রমহিলা ঠিক কোথায় নামেন?

মোড়ের মাথায়। লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজের দিকটায়।

ট্যাক্সি থামাতে কে বলেছিল?

ওই মাঝবয়সি ভদ্রলোক।

কীভাবে বলেছিল?

তেমন কোনও আলাদারকম করে নয়। বললেন, এখানে গাড়িটা থামান, একজন নামবে।

ভদ্রমহিলা যখন নামেন তখন তাঁকে দেখেননি?

না। টায়ার্ড ছিলাম। পিছনে তাকাইনি।

ভদ্রলোক—অর্থাৎ সেই মাঝবয়সি কোথায় নামল?

বালীগঞ্জ ফাঁড়ি।

তখন কী বলল?

শুধু বলল, একটু থামান, নামার আছে।

নেমে কিছু বলল না আপনাকে?

নেমে দরজা খোলা রেখেই বুড়ো ভদ্রলোককে বললেন, আবার কাল দেখা হবে, চলি।

বুড়ো লোকটি যখন জবাব দিল না তখন আপনার সন্দেহ হয়নি?

না তো! সন্দেহ করার মতো কিছু ছিল না।

তারপর কী হল?

ভদ্রলোক আমাকে বললেন, সোজা গড়িয়াহাট যাবেন।

ব্যস?

হ্যাঁ। আমি ভাবলাম ভাড়াটা বোধহয় বুড়ো ভদ্রলোকই দেবেন।

লোকটা যখন নামল তখন তার হাতে কি ব্যাগটা ছিল?

আমি দেখিনি।

আপনি পিছনে তাকাননি?

একবার তাকিয়েছিলাম। ব্যাগটা দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

তারপর বলুন।

গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার খানিকক্ষণ বাদে আমি হঠাৎ পিছনে একটা শব্দ পাই। তাকিয়ে দেখি বুড়ো মানুষটি সিটের ফাঁকে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন।

তখন কী করলেন?

গাড়ি থামিয়ে ভিতরের আলো জ্বাললাম। ভদ্রলোক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ভেবে নেমে পিছনে গিয়ে দরজা খুলে ওঁকে তোলার চেষ্টা করলাম। সিটে বসিয়েও দিলাম। ঘাড় লটপট করছিল।

আপনি কোনও হাসপাতালে না গিয়ে সোজা থানায় গেলেন কেন?

আমার কেন যেন মনে হয়েছিল ভদ্রলোক মারা গেছেন। আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

ঘটনাটা খুন বলে মনে হয়েছিল কি?

প্রথমটায় হয়নি। ভাবলাম স্ট্রোক থেকে কিছু হয়েছে।

স্ট্রোক বলে মনে হলে লজিক্যাল কাজ হল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া।

সেটা আমার মাথায় খেলেনি। তবে শুনেছি হাসপাতালে চট করে রোগী নিতে চায় না, ঝামেলা করে। তা ছাড়া থানায় গেলে থানা থেকেই যা করার করবে। আমরা ট্যাক্সিওয়ালারা পুলিশের ঝামেলাকে ভয় পাই। থানায় না গেলে হয়তো পরে ফ্যাকড়া তুলবে।

আপনার লেখাপড়া কতদূর?

এ প্রশ্নে সুমিত কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। মাথা নিচু। তারপর মৃদু স্বরে বলল, এ প্রশ্নের জবাব কি দিতেই হবে?

না দিলেও ক্ষতি নেই। কারণ আমরা আপনার সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর আমাদের চ্যানেলেও করেছি। দেখা যাচ্ছে আপনি একজন দর্শন শাস্ত্রে এম.এ। সত্যি নাকি?

হ্যাঁ। অনার্সের আগে বাবা মারা যান বলে রেজাল্ট খারাপ হয়েছিল। মাঝারি সেকেন্ড ক্লাস পাই। এম.এ পরীক্ষার আগে মায়ের ক্যানসার নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করতে হয়েছিল। এম.এ-র রেজাল্টও ভাল হয়নি। সেই সেকেন্ড ক্লাস।

আপনি কি ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার আশা করতেন?

আশা কার না থাকে বলুন।

ট্যাক্সি না চালিয়ে তো একটা মাস্টারির চাকরিও জোটাতে পারতেন।

না, পারতাম না। আমি সেই চেষ্টাও করেছি। হয়নি। তারপর ভাবলাম, মাস্টারির চাকরির প্রেস্টিজ এমন কিছু বেশি নয়। তারচেয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করা অনেক ভাল।

এই কাজে আপনি খুশি?

কে আর তার নিজের অবস্থায় খুশি থাকে বলুন।

রোজগার কেমন হয়?

খারাপ নয়। খাটলে টাকা আসে। আমার চলে যায়।

ভালভাবে চলে?

মোটামুটি। আমার তেমন বায়নাক্কা নেই। দু বেলা দু মুঠো ভাত আর বই আর গানের ক্যাসেট।

আপনি দেখছি খুব সাদাসিধে জীবনযাপন করেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সীতানাথবাবু যে খুন হয়েছেন সেটা কীভাবে জানতে পারলেন?

থানায় গিয়ে যখন ঘটনাটা বললাম তখন তারাই বডিটা পরীক্ষা করে বলল, মার্ডার কেস। আমাকে লক আপ-এ আটকানো হল।

কীভাবে সীতানাথবাবুকে খুন করা হয় জানেন তো!

জানি। গলায় দড়ির ফাঁস টেনে।

আপনি জবানবন্দিতে বলেছেন, এ কাজ আপনি করেননি!

হ্যাঁ। আমি করিনি।

পুলিশ বলছে, আপনার দেওয়া বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাদের বক্তব্য সেদিন সীতানাথবাবু একাই একটা ব্যাগ নিয়ে আপনার ট্যাক্সিতে ওঠেন। ব্যাগে অনেক টাকা বা অন্যান্য মূল্যবান জিনিস ছিল। উনি একজন ধনী ব্যক্তি। আপনি সেই ঝড়বৃষ্টির রাতে সুযোগ বুঝে ওঁকে খুন করে ব্যাগটা হস্তগত করেন। তারপর ব্যাগটা হাপিস করে থানায় গিয়ে—

হ্যাঁ। কিন্তু কাজটা আমি করিনি।

এর আগে আপনার কোনও ক্রিমিনাল রেকর্ড ছিল কি?

সুমিত খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর মৃদু স্বরে বলে, ক্রিমিন্যাল কেস কি না জানি না, তবে গোবিন্দপুরের কেসটার জন্য একবার পুলিশের খাতায় আমার নাম উঠেছিল।

ঘটনাটা কী?

আমার মা মারা যাওয়ার পর আমি কিছুদিন গোবিন্দপুর বস্তিতে ছিলাম। তখন সদ্য আমাদের বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে। আমার থাকার

জায়গা ছিল না।

আপনি যা বলবেন ভেবেচিন্তে বলবেন। কারণ আপনার সব বিবরণই আমাদের রেকর্ডে আছে।

তা আমি জানি।

তারপর বলুন।

এক কথা আমাকে বার বার বলতে হচ্ছে। হ্যাঁ বস্তিতে থাকার সময় কিছু ছেলেছোকরার সঙ্গে আমার ভাবসাব হয়ে যায়। তারা যে সবাই মার্কামারা বাজে ছেলে তা নয়। লো কালচারে মানুষ, তাই একটু অন্যরকম। পকেটমানিরও টানাটানি, সমাজে তেমন গ্রহণযোগ্যতা নেই, সবাই হ্যাটা করে, ভয়টয়ও পায়। আমি তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতাম, তাদের কালচারটা বুঝতে চেষ্টা করতাম।

আপনার তৎকালীন দোস্তদের নাম গুলে, পঞ্চা, হাবু, শীতল এবং আরও কয়েকজন।

হ্যাঁ।

তাদের প্রত্যেকেরই ক্রিমিন্যাল রেকর্ড আছে।

জানি। তবে পেটি কেসই বেশি।

পঞ্চা একজন কনডেমড খুনি। হাবুর বিরুদ্ধে পাঁচটা ডাকাতির কেস।

সবাই অল্পবিস্তর অপরাধ জগতে ঘোরাফেরা করত, আমি তা জানতাম।

জেনেও মিশতেন কেন?

ওখানে ওদের মতোই তো সবাই। কেউ কম, কেউ বেশি।

আমাদের তথ্য তা বলে না। ওইসব বস্তিতে ক্রিমিন্যাল রেকর্ড ছাড়াও অনেকেই আছে।

আছে। কেউ কেউ হয়তো হায়ার কালচারের লোক, অভাবগতিকে বস্তিতে এসে থাকতে হয়েছে। তাদের মুশকিল বেশি। গা বাঁচিয়ে থাকতে হয়।

আপনিও তো একজন হায়ার কালচারের লোক। কিন্তু আপনি তো খুব সহজেই দুর্বৃত্তদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন।

আমি যে ঘরটায় থাকতাম তার আশেপাশেই ওরা থাকত। তাই চেনাজানা হয়ে গিয়েছিল।

ওরা আপনার ট্যাক্সিটাকে খুব সাকসেসফুলি কাজে লাগিয়েছিল এবং আপনি অন্তত তিনবার ওদের সঙ্গে ডাকাতিতে অংশ নেন।

সুমিত খুব ক্লান্তভাবে অফিসারের দিকে চেয়ে থেকে বলল, আমি আর

নিজেকে ডিফেন্ড করতে পারছি না। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করছে না।

বিশ্বাসযোগ্যতা থাকলে বিশ্বাস করবে না কেন? বলুন।

ওরা মাঝেমধ্যে আমার ট্যাক্সিতে উঠে একটু-আধটু ঘুরতে বেড়াতে যেত ঠিকই। কিন্তু একবার ছাড়া আর কোনওবারই কোনও ক্রিমিন্যাল উদ্দেশ্যে নয়।

সেই একবারের কথা বলুন।

পঞ্চা, গুলে আর শীতল আমাকে খুব ধরেছিল, একদিন ট্যাক্সিটা নিয়ে বেরোবে বলে।

বেরোবে মানে আপনাকে বাদ দিয়ে নাকি?

হ্যাঁ। কিন্তু ট্যাক্সিটা আমার খুব আদরের। ওটাই আমার একমাত্র অবলম্বন। তাই আমি ওদের হাতে গাড়ি ছেড়ে দিতে রাজি হইনি। এই নিয়ে ওদের সঙ্গে একটু মন কষাকষিও হয়। শেষ অবধি ঠিক হয় আমি ওদের নিয়ে সোনারপুরে যাব। ওরা নেমে একটা কাজে যাবে, আমি গাড়িতে বসে থাকব।

আপনার কি মনে হয়েছিল যে ওরা ডাকাতি করতে যাচ্ছে বা ওইরকম কিছু?

হয়েছিল। আমি ওদের জিজ্ঞেসও করেছি। ওরা শুধু বলেছে, না গুরু, কোনও খারাপ কাজ নয়। শুধু একটা লোকের সঙ্গে হিসেব মেটানো। আমার উপায় ছিল না। রাজি না হলে হয়তো আমার পক্ষে বিপজ্জনক হযে উঠত।

আপনি কি ওদের ভয় পেতেন?

গুলে আর পঞ্চা সম্পর্কে আমার ভয় ছিল। ওদের চেহারায় নৃশংসতার ছাপ আছে।

তারপর কী হল?

সোনারপুরে একজায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে ওরা একটা গলির মধ্যে ঢুকে যায়।

তখন কটা বাজে?

রাত সাড়ে বারোটা হবে।

আপনার সন্দেহ হয়নি?

হয়েছিল। কিন্তু উপায়ও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ট্র্যাপে পড়ে গিয়েছিলাম।

তারপর বলুন।

কী ঘটনা ঘটেছিল আমি তা জানি না। তবে ট্যাক্সিতে বসে আমি একটা চেঁচামেচি শুনতে পেয়েছিলাম।

ওরা গলিতে ঢোকার কতক্ষণ পরে?

ঘড়িতে তখন একটা বাজে। আধঘণ্টা পরে। চেঁচামেচি হতে হতেই ওরা দৌড়ে এসে ট্যাক্সিতে উঠল। আমি গাড়ি ছেড়ে দিলাম।

ভাগ বাঁটোয়ারা কখন হল?

আমি জানি না। পরদিন সকালে পঞ্চা আমাকে কিছু টাকা দিতে এসেছিল। আমি নিইনি।

তা হলে আপনি একজন অত্যন্ত সৎ লোক বলে দাবি করছেন?

দাবি নয়। যা সত্যি তাই বলছি।

কিন্তু সুমিতবাবু, আমাদের সাক্ষ্যপ্রমাণ যে অন্য কথা বলছে। ইউ ওয়্যার দি মাস্টার মাইন্ড বিহাইন্ড দ্যাট অপারেশন। ডাকাতিটা কার বাড়িতে হয়েছিল আপনি জানেন?

তখন জানতাম না। পরে জেনেছি।

ভদ্রলোকের নাম জাহ্নবীকুমার বসু।

হ্যাঁ।

নামটা কি চেনা চেনা ঠেকছে?

না তো!

আহা, চোখ নামিয়ে নিলেন কেন? অস্বস্তি বোধ করার কারণ নেই। পুলিশের এনকোয়ারিতে ব্যাপারটা ধরা না পড়লেও আমার নিজস্ব পদ্ধতিতে আমি একটু গভীরে যেতে ভালবাসি।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

বুঝতে না পারার কিছু নেই। পঞ্চা, গুলেরা ধরা পড়ার পর খুব জোর দিয়ে বলেছিল, এই ডাকাতির পিছনে আপনার কোনও হাত ছিল না।

ওরা সত্যি কথাই বলেছে।

আপনি তা হলে জাহ্নবীকুমার বসুকে চিনতে পারছেন না?

না।

যদি বলি আপনি সত্যি কথা বলছেন না! জাহ্নবীবাবুকে আপনি খুব ভাল চেনেন এবং তাঁর সবরকম খবরই আপনার নখদর্পণে।

সুমিত নিজের করতলের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল।

রাত সাড়ে বারোটার সময় একজন গৃহস্থের বাড়ির দরজা যেভাবে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে খোলানো হয়েছিল তত চতুরতা ওইসব পঞ্চা বা গুলেদের নেই। আপনি কি জানেন কীভাবে দরজা খোলানো হয়েছিল?

সুমিত চুপ করে থাকে।

তা হলে আমিই আপনাকে বলছি। জাহ্নবীবাবুর একটি মেয়ে আছে।

সোনালি। ঘটনার দিন সোনালি পাড়ার এক দাদা বউদির সঙ্গে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে একটা ক্লাসিকাল মিউজিকের ফাংশনে গিয়েছিল। ফিরতে তার রাত হওয়ার কথা। বাড়ির লোক তার জন্য অপেক্ষা করছিল। রাত সাড়ে বারোটায় ডোরবেল বাজলে জাহ্নবীবাবুর স্ত্রী দরজা খুলতে যান। সোনালিই এসেছে বলে ধরে নিয়েছিলেন তিনি। তবু দরজা খোলার আগে তিনি সতর্কতার জন্য জিজ্ঞেস করেন, কে? বাইরে থেকে মেয়ে গলায় কেউ বলে, আমি, আমি। গলাটা সোনালির কি না তা আর বিচার করেননি তিনি। দরজা খুলে দেন এবং গুলে পঞ্চারা ঢুকে পড়ে। আমরা জানি হাবু পাড়ার যাত্রায় মেয়ের পার্ট করে।

সুমিত মাথা নিচু করে চুপ করে থাকে।

গুলে বা পঞ্চারা জানতও না যে জাহ্নবীবাবুর মেয়ে আছে কিনা, বা সে সেদিন কোথায় গেছে বা কত রাতে ফিরবে। কিন্তু আপনি জানতেন। আপনি এও জানতেন, সেদিন জাহ্নবীবাবু একটা মোটা টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছিলেন পরদিন একটা পেমেন্ট করবেন বলে। গুলে পঞ্চাদের আপনি শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

সুমিত চুপ।

এবার জাহ্নবীবাবুর পরিচয়টা আপনাকে একটু দিই। যে ব্যবসাটা করতে গিয়ে আপনার বাবা সর্বস্বান্ত হন সেই ব্যবসায়ে আপনার বাবার পার্টনার ছিলেন জাহ্নবী বোস। তিনি কেমন লোক তা আমরা জানি না। কিন্তু আপনার ধারণা আপনার বাবাকে পথে বসিয়েছিলেন তিনিই। জাহ্নবীবাবুর মেয়ে সোনালির একসময় আপনার ওপরে দুর্বলতা জন্মেছিল। আপনারও হয়তো একটু দুর্বলতা ছিল। কিন্তু আপনার বাবার সর্বনাশের পর আপনি সোনালির প্রতি বিমুখ হন।

সুমিত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

এই ডাকাতির ঘটনার তদন্তকারী অফিসার কোনও এক রহস্যময় কারণে গুলে, পঞ্চাদের ধরলেও আপনাকে ধরেনি। যদিও আপনার কথা পুলিশ পরে জানতে পেরেছিল। কেন ধরেনি তার কারণটা আমাকে একটু কষ্ট করে জানতে হয়েছে। কারণ হল, সেই পুলিশ ইন্সপেক্টরটি ছিলেন আপনার জ্যেঠতুতো দাদা বিকাশ ঘোষাল। আপনাকে না ধরলেও আপনার নামটা কিন্তু পুলিশের রেকর্ড থেকে বাদ দেওয়া যায়নি।

সুমিত চুপ করে থাকে।

জাহ্নবীবাবুর স্টেটমেন্ট অনুযায়ী তাঁর বাড়ি থেকে সেই রাতে নগদ দু লাখ টাকা এবং আরও লাখ দুই টাকার গয়না ডাকাতি হয়। এগুলো অবশ্য

আর উদ্ধার করা যায়নি। পঞ্চা, গুলে, হাবু মাসখানেক পর ধরা পড়লেও প্রমাণাভাবে খালাস পেয়ে যায়। আর আপনাকে পুলিশ ছোঁয়নি।

সুমিত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমার বিরুদ্ধে কি ডাকাতির কেসটা আবার উঠবে?

আরে না মশাই। আমি শুধু আপনার বায়োডাটাটা মিলিয়ে নিচ্ছিলাম। আপনাকে অ্যাসেস করতে হলে ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানা দরকার। বাই দি বাই, গুলে, পঞ্চা, হাবু, শীতল অর্থাৎ গোবিন্দপুরের রুস্তমরা কিন্তু এখনও আপনার নামে সেলাম ঠোকে। আপনি কি এখনও তাদের গুরু?

না। কস্মিনকালেও ছিলাম না।

আপনি এখনও মাঝে মাঝে ও পাড়া যান এবং এখনও ওখানে আপনার একটু প্রভাব আছে। তাই না?

পুরনো জায়গা বলে যাই। কোনও স্বার্থ নেই।

জাহ্নবীকুমার বসুর বাড়িতে ডাকাতিটা আপনি কেন করিয়েছিলেন তা বলবেন কি?

সুমিত চুপ।

তা হলে আমিই বলি। কারণটা সোজা। আপনি একটা প্রতিশোধ নিতেই কাজটা করেন। ইন্সপেক্টর বিকাশ ঘোষালও সেটা জেনেই আপনার ইনভলভমেন্টটা চেপে যায়। হাতে পেয়েও অ্যারেস্ট করেনি। জাহ্নবীবাবু বা সোনালি এখনও জানে না যে, ডাকাতির প্ল্যানটা ছিল আপনার। কিন্তু সেই কেসটা থেকে বেঁচে গেলেও সীতানাথবাবুর কেসটা থেকে বাঁচা শক্ত হবে আপনার পক্ষে।

সীতানাথবাবুর কেসে আমাকে অকারণ হয়রান করা হচ্ছে।

আপনার বিরুদ্ধে সারকামস্ট্যানসিয়াল এভিডেন্স অত্যন্ত জোরালো। আপনার কোনও অ্যালিবাইই নেই। যে রহস্যময়ী মহিলা বা গোঁফওয়ালা মধ্যবয়সি পুরুষের বিবরণ দিয়েছেন তাদেরও ট্রেস করা যায়নি।

কিন্তু আমার তো কোনও দোষ নেই।

সেটা আদালত বুঝবে। সীতানাথবাবু বিরাট ব্যবসায়ী। তাঁর কোটি কোটি টাকার ব্যবসা। তিনটে কোম্পানির মালিক।

কিন্তু আমি তো তাঁকে চিনতাম না।

সেটাও প্রমাণসাপেক্ষ। তদন্তে জানা গেছে, তিনি সেদিন সিঁথিতে কেন এবং কার সঙ্গে গিয়েছিলেন তা কেউ জানে না। ওই অঞ্চলে তাঁর কোনও কাজ ছিল বলেও তাঁর বাড়ির লোক বা সেক্রেটারি বা অফিসের কেউ বলতে পারছে না। আপনার বিবরণমতো কোনও লোকের কথাও কেউ

বলতে পারছে না। সীতানাথবাবুর অন্তত বারোখানা গাড়ি আছে। বৃষ্টির দিনে তিনি গাড়ি ছাড়া কেন বেরিয়েছিলেন তার কারণও কেউ জানে না।

সেটা হতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে আমাকে কেন জড়ানো হচ্ছে?

সীতানাথবাবুর সঙ্গে আপনার কোনও যোগাযোগ ছিল কি না কিংবা আপনার পুরনো প্রতিশোধস্পৃহা এখানেও কাজ করেছে কি না আমরা সেই অ্যাঙ্গেলটা দেখছি।

সুমিত ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে বলল, গত পনেরো দিন আমি বিনা কারণে আটক রয়েছি। এর কোনও মানেই হয় না।

পুলিশ অফিসার এবার একটু হাসলেন। হঠাৎ বললেন, পুলিশ তার লাইনে ঠিক কাজই করেছে। কিন্তু আমার পদ্ধতি একটু ভিন্ন। আমি আপনাকে ছেড়ে দিতে চাই।

সুমিত উদ্দীপ্ত হয়ে বলে, ছেড়ে দেবেন?

একটা শর্তে।

কী শর্ত?

রোজ একবার করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। টেলিফোন করলেই হবে। আমার নাম শবর দাশগুপ্ত, গোয়েন্দা পুলিশ। টেলিফোন নম্বরটা নিয়ে নিন।

শুধু এইটুকু?

হ্যাঁ, আপাতত এইটুকুই। তবে আবার ভেবে বসবেন না যে আপনাকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। সীতানাথবাবুর মার্ডার কেসে এখনও আপনিই প্রাইম সাসপেক্ট। আমি আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি আমার নিজের রিস্ক-এ।

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ও ভাল কথা, আপনার সঙ্গে কি সোনালির এখনও যোগাযোগ আছে?

না নেই।

প্রেমটা কেঁচেই গেছে তা হলে?

প্রেম কখনও ছিল না।

সোনালির দিক থেকে তো ছিল?

হয়তো। কিন্তু আমি কখনও ইন্টারেস্টেড ছিলাম না। কিন্তু এই কেসে হঠাৎ সোনালির কথা আসছে কেন? এ ব্যাপারে তার তো কোনও ভূমিকা নেই।

না। সোনালি ইনসিগনিফিক্যান্ট। আমি আসলে আপনাকে স্টাডি করছি।

সুমিত একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার একটা প্রশ্নের জবাব

দেবেন?

কী প্রশ্ন?

আমি একজন সামান্য ট্যাক্সিওয়ালা। কোনও ইম্পর্ট্যান্ট পারসন নই, এমনকী পলিটিকাল কোনও লিনিংও নেই। কিন্তু তবু আপনি আমার সম্পর্কে এত তথ্য জোগাড় করেছেন কেন সেটাই ভেবে পাচ্ছি না। এমনকী সোনালির সঙ্গে প্রেম কিংবা জাহ্নবীবাবুর সঙ্গে আমার বাবার কানেকশন এসব তো কারও জানার কথা নয়।

ছোটখাটো, ছিপছিপে, কিন্তু শক্তপোক্ত চেহারার শবর দাশগুপ্ত একটু হাসল। তারপর বলল, আপনি এ কয়দিন পুলিশ কাস্টডিতে ছিলেন বলে হয়তো টের পাননি যে ইতিমধ্যে আপনি একটু বিখ্যাত হয়ে গেছেন, সীতানাথ খুনের মামলার সম্ভাব্য আসামি হিসেবে ছবিসহ আপনার কথা সব খবরের কাগজে বেরিয়ে গেছে। সেইটে পড়েই সোনালি আমাদের অ্যাপ্রোচ করে। সে নানাভাবে পুলিশকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে আপনি ভাল লোক, খুন করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। তার কাছ থেকেই আমরা আপনার সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারি। সম্ভবত সে আপনাকে এখনও ভালবাসে।

মাথা নেড়ে সুমিত বলে, না শবরবাবু, ওটা ঠিক ভালবাসা নয়। তবে সোনালি সিমপ্যাথেটিক। ওর বাবা যে আমার বাবাকে ডুবিয়ে দিয়েছিল সেটা ও কখনও সহ্য করতে পারেনি। আমাকে কয়েকবারই ও কথাটা বলেছে। কিন্তু ওর তো কিছু করার নেই। আর প্রেমের ব্যাপারটা কখনও ম্যাচিয়োর করেনি। সোনালি আর একটি ছেলের সঙ্গে এনগেজড। আপনি খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন। আমার সঙ্গে সোনালির সম্পর্ক নিতান্তই বন্ধুত্বের। তার বেশি কিছু নয়।

বুঝেছি। আর কিছু জানতে চান?

হ্যাঁ। এই যে আপনি আমাকে ছেড়ে দিচ্ছেন, আমার মনে হচ্ছে এর পিছনেও আপনার কোনও উদ্দেশ্য আছে। সেইটে যে কী তা বুঝতে পারছি না বলে একটু অস্বস্তি হচ্ছে।

শবর ফের হাসল। বলল, আমি কোনও সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক রাখা পছন্দ করি না। বরং তাকে ছেড়ে দিলে সে নানারকম ব্লান্ডার করে নিজের কবর নিজেই খুঁড়তে থাকে।

আমাকে সেইজন্যই ছেড়ে দিচ্ছেন?

হ্যাঁ। কিন্তু মনে রাখবেন রোজ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ভুল যেন না হয়।

॥ তিন ॥

তুমি বামুনের মেয়ে?

হ্যাঁ।

আমাদের বাড়িতে রান্নার কাজ করবে?

দীয়া ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে গেল। বলল, কিন্তু আমার তো সময় হয় না।

অন্য বাড়িতে কাজ কর বুঝি?

না তো! আমাকে ঘরের কাজ করতে হয়।

ঘরে কি অনেক কাজ?

আমার মা কাজে যায়, আমাকেই সব করতে হয়। রান্না থেকে শুরু করে সব।

তা থেকে একটু সময় বের করতে পার না? সকালে দু ঘণ্টা আর বিকেলে দু ঘণ্টা।

মা তো আমাকে কাজ করতে দেয় না। মায়ের সঙ্গে কথা বলে দেখি।

তোমার মাকে একবার আসতে বোলো। আমরা ভাল মাইনে দেব। তোমার মা যদি করতে চায় করতে পারে।

মা দু বাড়িতে রান্না করে।

ও বাবা! আমি যে কী মুশকিলে পড়েছি। আমার বিধবা শাশুড়ি আছে। তার খুব শুচিবায়ু। বামুনের রান্না ছাড়া'ছোঁবে না। আমাদেরও তাই। ঘরে নারায়ণশিলা আছে, গুরুদেবের ছবি আছে। অনাচার করা চলবে না।

মার সঙ্গে কথা বলে পরে জানাব।

তোমাকেই আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। চেহারায় বামনাই ছাপ বেশ স্পষ্ট। আজকাল তো অনেকেই দরকারমতো বামুন সাজে। তোমাকে দেখে মনে হয় তেমন নও।

দীয়া মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার কেন যেন একটু অপমান লাগছে।

কী গোত্র তোমাদের?

কৃষ্ণাত্রেয়।

ও বাবা। এ গোত্র তো খুব কম শোনা যায়। এ বাড়িতে মেয়ের মতোই আদর পাবে। কাজের লোকের মতো নয়।

দীয়ার মা নিজে লোকের বাড়িতে কাজ করে বটে, কিন্তু মেয়েও সেটা করুক তা কখনও চায় না। সেটা মায়ের সম্মানে লাগে। বলে, আমি পেটের

দায়ে কুলের মর্যাদা বিসর্জন দিয়েছি বটে, কিন্তু তোরা দিবি কেন? কষ্ট একটু হয় হোক, তোদের গায়ে কাজের মেয়ের ছাপ্পা মারতে দেব না কাউকে।

তাদের যা অবস্থা তাতে হয়তো অহংকার করা মানায় না। হয়তো পেটের দায়ে তাকেও একদিন কাজ করতে হবে। কিন্তু যতদিন পারা যায় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতেই চায় দীয়াও। অন্যের বাড়িতে কাজ করে মাসের শেষে হাত পেতে মাইনে নিতে নিতে সে ঠিক আর পাঁচটা মেয়ের মতো ঝি হয়ে যাবে।

শোনো দীয়া, আমার বড্ড ঠেকা। তোমার মাকে নিয়ে আজ সন্ধেবেলাতেই একবার এসো। লোকের বাড়িতে যা দেয় আমি তার চেয়ে বেশি দেব। পুজোর জামাকাপড়, পার্বণী সব পাবে। হেনার কাছে শুনেছি, তুমি নাকি খুব ভাল মেয়ে। তোমাকে আমারও খুব ভাল লেগেছে।

দীয়া মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। অনেক লোকের হাতে আজকাল অনেক টাকা। স্বামী-স্ত্রী চাকরি করে যে সব পরিবারে, তারা দায়ে পড়েই লোক রাখে। না রেখে উপায় নেই। যূথিকা এক বাড়িতে বাচ্চা রাখে, হাজার টাকা মাইনে পায়। দীয়ার টাকাপয়সার কথা ভাল লাগে না।

সে বলল, এখন আসি?

এসো। কিন্তু মনে থাকে যেন, সন্ধেবেলা মাকে নিয়ে আসবে।

দীয়া সংক্ষেপে বলল, দেখি—

না না, দেখিটেখি নয়। এসো অবশ্যই। একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে জল খাও তো—

দীয়া বলল, না না, মিষ্টির দরকার নেই।

তোমার নেই, আমার আছে। শুধু মুখে যেতে নেই রে মেয়ে।

ভদ্রমহিলা ফ্রিজ খুলতে যাচ্ছেন, এমন সময় ডোরবেল বেজে উঠল। ভদ্রমহিলা গিয়ে দরজা খুলে যেন একটু বিরক্ত হয়েও মুখে হাসি এনে বললেন, এ কী? তুমি! কী চেহারা হয়েছে!

যে লোকটা ঢুকল সে বেশ লম্বা চওড়া, গালে বেশ কয়েকদিনের দাড়ি, রুক্ষ চুল, মোটা গোঁফ। গায়ে ট্যাক্সিওলার পোশাক। চিনতে পারল দীয়া। বুলুদা। একসময় খুব ভাব ছিল বাবার সঙ্গে।

দাদা কোথায়?

বা রে, তোমার দাদা কি এ সময়ে বাড়ি থাকে? থানায় থাকার কথা। তুমি কি ছাড়া পেয়ে গেলে?

সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না বলেই দাদার কাছে আসা। একটু জল

খাওয়াও তো।

হ্যাঁ বোসো, দিচ্ছি।

বুলুদা প্রথমে তাকে লক্ষ করেনি। ভদ্রমহিলার হাত থেকে জলের গেলাসটা নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঢক ঢক করে খেয়ে হাতের পিঠে মুখ মুছে হঠাৎ তাকে দেখতে পেল। কয়েক সেকেন্ড তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, আরে! এ পরেশদার মেয়ে না?

চেন নাকি?

চিনব না মানে? একসময় তো এ পাড়াতেই ছিলাম।

ও তাও তো বটে। ভুলেই গিয়েছিলাম। তোমার সুবাদেই তো আমাদের এ পাড়ায় ফ্ল্যাট কেনা হল। তা চেনই যদি তা হলে দাও না ওকে রাজি করিয়ে।

বুলুদা অবাক হয়ে বলে, কীসে রাজি করাব?

জানই তো আমাদের বাড়িতে বামুন রাঁধুনি ছাড়া চলবে না। আমি চাকরি করতে বেরিয়ে যাই সেই সাতসকালে। কী যে মুশকিলে পড়েছি। একে আমার ভারী পছন্দ হয়েছে। মুখখানা দেখেছ? ভারী সুশ্রী।

ওকে রাঁধুনি রাখতে চাও নাকি?

তাই তো বলছি। রাজি হচ্ছে না যে!

বুলুদা হাসল, রাজি হবে কী করে? ওরা এখনও সেই স্তরে মানসিকভাবে নামতে পারেনি।

আহা, ওর মা তো রাঁধুনির কাজ করছেই।

তা জানি। ওর মাকে আমিই একটা বাড়িতে চাকরি দিয়েছিলাম। তখন ওদের উপায় ছিল না। ওকে ছেড়ে দাও বউদি। পরেশদা শুনলে দুঃখ পাবেন। অবস্থা পড়ে গেছে বটে, কিন্তু লোকটা বড্ড সেন্টিমেন্টাল।

আচ্ছা বাপু, আজকাল কি কেউ প্রেস্টিজ আঁকড়ে বসে থাকে? চাকরি নিলে ওদের সংসারেরও তো আয় হয়।

তা হয়তো হয়। কিন্তু পরেশদা আর বউদি সামান্য কাজ করলেও ছেলেমেয়েদের গায়ে আঁচ লাগতে দিতে চায় না। তোমার একজন বামুন রাঁধুনি হলেই চলবে তো!

হ্যাঁ ভাই, দাও না জোগাড় করে।

চেষ্টা করব।

কিন্তু এই মেয়েটাকে আমার বড্ড পছন্দ হয়েছিল। এই মেয়ে, চাকরি না নিস আমার কাছে মাঝে মাঝে আসিস। আমি গান জানি, তোকে শেখাব। আসবি?

এবার একগাল হাসল দীয়া। ঘাড় হেলিয়ে বলল, আসব।

বুলুদার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মনটা ভরে গেল। ভদ্রমহিলা ফ্রিজ খুলে গোটাচারেক মিষ্টি একটা প্লেটে বেড়ে তাকে দিয়ে বলল, খাও। বুলু, তুমি কী খাবে?

আরে আমার কি পেটে জায়গা আছে। পনেরো দিন পুলিশ কাস্টডির খাবার খেতে হয়েছে, বুঝতেই পার। ছাড়া পেয়েই পাঞ্জাবি হোটেলে ঢুকে খুব খেয়েছি। তার ওপর পাড়ায় ঢুকতেই ছেলেরা ধরেছে, শনিপুজোর খিচুড়িভোগ খেয়ে যেতে হবে। একটু চা দিতে পার।

দিচ্ছি। তোমরা এক মায়ের পেটের ভাই নও বটে, কিন্তু তোমার দাদা তোমাকে অন্ধের মতো ভালবাসে। তোমার অ্যারেস্টের পর থেকেই ফুঁসছে, বুলুটাকে ফলস কেস-এ ধরল। এটা পুলিশের ভীষণ অন্যায়। এসবের জন্যই পুলিশের চাকরি করতে ইচ্ছে করে না। আরও কত কথা। শুনলাম তোমার কেসটায় গোয়েন্দা পুলিশ নামানো হয়েছে।

হ্যাঁ। হয়তো সেজন্যই বেঁচে গেছি। শবর দাশগুপ্তের নাম শুনেছ?

ও বাবা! সে তো সাঙ্ঘাতিক লোক!

কীরকম সাঙ্ঘাতিক?

খুব নাকি তুখোড়, আর ভীষণ সাহসী। কাউকে পরোয়া করে না। তাকে কোথায় পেলে?

সে-ই আমার কেসটা দেখছে।

তা হলে চিন্তা কোরো না। সে খুব বুদ্ধিমান লোক।

মনে তো তাই হচ্ছে। ভাবছি আমাকে হঠাৎ বিনা মুচলেকা, বিনা জামিনে এই ছেড়ে দেওয়ার অর্থ কী? শত হলেও মার্ডার কেস। সেইজন্যই দাদার কাছে এসেছিলাম ব্যাপারটা বুঝতে।

তুমি নির্দোষ বুঝতে পেরেই ছেড়ে দিয়েছে। চিন্তা করছ কেন?

চিন্তা করছি এজন্য যে, পুলিশ এভাবে কাজ করে না। আমার বিরুদ্ধে চার্জটা কিন্তু জোরালোই ছিল।

বোসো, চা খাও। এই দীয়া, চা করতে পারবি?

দীয়া একগাল হেসে ফের ঘাড় কাত করে বলে, হ্যাঁ।

গ্যাস জ্বালাতে পারিস?

পারি। আমাদের পাশের ঘরে মনোহরকাকাদের গ্যাস আছে।

তা হলে যা না, রান্নাঘরে দেখবি সামনেই চায়ের সরঞ্জাম সাজানো আছে।

আপনিও খাবেন?

আমি! আচ্ছা দু কাপই করে আন। কেমন করিস দেখি।

দীয়া রান্নাঘরে এসে মুগ্ধ হয়ে গেল। কী সুন্দর সব সাজানো! এখন বিকেল বলেই বোধহয় চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে রাখা আছে। চা করতে করতে সে শুনতে পাচ্ছিল, ও ঘরে ওরা কথা বলছে।

তোমাকে মার্ডার কেসে ফেলল কেন বলো তো!

ফেলারই কথা। আমার ঠিক পিছনেই সীতানাথবাবু বসে ছিলেন। পাশে আর দুজন। এত কাছে একটা লোককে গলায় ফাঁস দিয়ে মারা হল অথচ আমি টেরই পেলাম না। খুন করে ওরা সেফলি নেমেও গেল। লোকটা তো সীতানাথবাবুকে উদ্দেশ্য করে কথাও বলল। নিখুঁত অভিনয়। পুলিশ গল্পটা বিশ্বাস না করলে দোষ নেই।

কাগজে দেখেছি, সীতানাথবাবুর হাতে ব্যাগ ছিল। হয়তো টাকার জন্যই খুনটা করেছে। কে করেছে বলো তো! মেয়েটা না লোকটা?

কে জানে! দুজনের একজন বা দুজনে মিলেই। কিন্তু আমার রিফ্লেক্স কমে গেছে বউদি। আমার টের পাওয়া উচিত ছিল।

কী করে টের পাবে বলো তো! খবরের কাগজে পড়েছি সেদিন খুব ঝড়বৃষ্টি ছিল।

হ্যাঁ। কিন্তু গাড়ির তিনটে কাচ বন্ধ ছিল। আমার ডানদিকের জানালাটাই শুধু একটু ফাঁক করা ছিল।

তা হলে?

তবু আমার টের পাওয়া উচিত ছিল। গলায় ফাঁস দিলে একটা লোক একটু ছটফট তো করবে! নিশ্চয়ই সীতানাথবাবুও হাত পা ছুড়েছিলেন। আমার স্মৃতিশক্তি কমে গেছে কিনা জানি না। আমি কিছুই রিকালেক্ট করতে পারছি না।

অত ভেবো না। শেষে নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে যাবে।

না। এখনও ভেঙেটেঙে পড়িনি। কিন্তু ভাবছি।

বরং পুলিশের ওপরেই নির্ভর করো। শবর দাশগুপ্ত খুনিকে ঠিক খুঁজে বের করবে।

করলেই ভাল।

তোমার দুবাই যাওয়ার কী হল? মাঝখানে শুনেছিলাম সেই ভদ্রলোক নাকি তোমাকে দুবাই নিয়ে যাবেন!

প্রস্তাব একটা দিয়েছিলেন বটে। কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম, একজন ফিলজফির এম.এ পাশ লোকের জন্য দুবাই নিশ্চয়ই কোল পেতে বসে নেই। ভদ্রলোক দয়ালু বলেই বলেছেন। নিয়ে গিয়ে হয়তো কেরানিগিরি

করাবেন। তারচেয়ে কলকাতায় ট্যাক্সি চালিয়ে আমি অনেক ভাল আছি। না বউদি, দুবাই ইজ আউট।

তা হলে সেই মেয়েটির কী হবে?

কে?

সোনালি।

দুর! সোনালি ওয়াজ নেভার ইন দি পিকচার।

তা হলে সংসারধর্ম?

সংসারধর্ম ব্যাপারটাই আমার উটোপিয়া বলে মনে হয়। ধরে নাও আমি কনফার্মড ব্যাচেলার।

বাবার দোষেই তোমার জীবনটা ছন্নছাড়া হয়ে গেল বুলু।

বাবার দোষ? সে তো খানিকটা বটেই। কিন্তু আমিও তো কিছু করে উঠতে পারিনি। তাঁর টাকা তিনি উড়িয়েছেন, আমার কী বলার আছে বলো! আমি পারিনি আমার দোষে।

দীয়া দু কাপ চা একটা ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে গিয়ে দুজনের সামনে সাবধানে নামিয়ে রাখল। চা একটুও চলকায়নি প্লেটে।

এক চুমুক চা খেয়েই ভদ্রমহিলা বললেন, 'বাঃ, বেশ চা করিস তো!'

লজ্জায় ফের একটু হাসল দীয়া। যার কাছ থেকে একটু প্রশংসা আশা করেছিল সেই বুলুদা কিছুই বলল না। উদাস মুখে চায়ে চুমুক দিয়ে যাচ্ছিল। তার দিকে তাকালও না।

ঝটপট চা শেষ করে উঠে পড়ল বুলুদা। বলল, চলি বউদি, অনেক কাজ জমে গেছে। পয়লা কাজ চুল আর দাড়ি বানানো।

দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছিল বুলুদা, ভদ্রমহিলা বললেন, শোনো বুলু, একটা জরুরি কথা।

কী বলো।

আমাদের উলটোদিকের ওই ফ্ল্যাটটায় সমরেশ ভট্টাচার্য বলে একজন সদ্য এসেছেন। তাঁর সঙ্গে শনি পুজোর চাঁদা নিয়ে পাড়ার ছেলেদের গণ্ডগোল লেগেছে। ওরা নাকি বলে গেছে ভদ্রলোককে মারবে।

ও।

তুমি তো ওদের চেন! একটু দেখবে? ভদ্রলোকের স্ত্রী ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন। সমরেশবাবুও বেরোতে সাহস পাচ্ছেন না।

বুলুদা একটু তাচ্ছিল্যের কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, ঠিক আছে। ওটা কিছু নয়। আমি ওদের পাঠিয়ে দেবখন, কুড়িটা টাকা যেন দিয়ে দেয়। বেকার ছেলে সব। কিছু কিছু তোমরা না দিলে ওদের চলবে কেন?

বাঁচালে ভাই। যা ভয় পাচ্ছিলাম। ছেলেগুলো নাকি ভীষণ গুন্ডা।

একটু ভাব ভালবাসা করে চলো, তা হলে ঝামেলা হবে না। বরং বিপদে-আপদে ওরাই বাঁচাবে।

দাঁড়াও ভাই, তুমি নিজের মুখে ওদের একটু বলে যাও। ওরা ভয়ে একদম গুটিয়ে আছে। একটু দাঁড়াও—

বলে ল্যান্ডিংটা পার হয়ে উলটোদিকের ফ্ল্যাটের ডোরবেলটা বাজালেন ভদ্রমহিলা।

বেশ কিছুক্ষণ পর দরজাটা খুব সামান্য একটু ফাঁক হল।

মউ, আমি বিদিশাদি। ভয় নেই, দরজা খোলো।

মউ দরজা খুলল। ছিপছিপে সুন্দর চেহারার অল্পবয়সি মেয়ে। চোখে রাজ্যের ভয় আর উৎকণ্ঠা।

এই আমার দেওর বুলু। পাড়ার সবাই ওকে খুব মানে। ভয় পেয়ো না, ও সব ঠিক করে দেবে।

মউ একটু অবাক হয়ে বুলুর দিকে চেয়ে থাকে। তারপর অস্ফুট গলায় বলে, সুমিত!

বুলু একটু হাসল, কী আশ্চর্য কাণ্ড! তুমি এখানে!

বিদিশা অবাক হয়ে বলে, ওমা, তোমরা দুজনে দুজনকে চেন নাকি?

মউ শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে ভেজানোর চেষ্টা করে বলে, চিনব না কেন? আমরা কলেজ আর ইউনিভার্সিটিতে ক্লাসমেট ছিলাম যে। এসো সুমিত, ঘরে এসো। খবরের কাগজে তোমার কথা পড়েছি। এসো।

বুলু মাথা নেড়ে বলে, আজ নয়। সবে পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেয়েছি। পোশাকটাও ভদ্রস্থ নয়, তোমার হাজব্যান্ড আমাকে দেখলে আঁতকে উঠবেন। তবে আসার রাস্তা খোলা রইল। আসবখন।

মউয়ের চোখে একটু জল চিক চিক করে উঠল। স্খলিত গলায় বলল, সাধ করে ফ্ল্যাট কিনে এসেছি, কী বিপদ যাচ্ছে দেখো! দুশো টাকা চাঁদার বিল ধরিয়ে গেছে। আমার হাজব্যান্ড প্রটেস্ট করায় কী ঝগড়া আর খারাপ খারাপ গালাগাল! আমার আর একদিনও থাকতে ইচ্ছে করছে না এখানে। বিকাশদা পুলিশের লোক, উনি বললেন এসব ঝগড়া কাজিয়া আপসে মিটিয়ে ফেলাই ভাল। পুলিশ অ্যাকশন হলে নাকি ওরা খেপে যাবে।

দাদা ঠিকই বলেছে। অত ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আর কেউ তোমাদের অপমান করবে না। আমি একটা ছেলেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাকে কুড়ি টাকা চাঁদা দিয়ে দিলেই হবে।

হবে? সত্যি বলছ?

হবে। এবং সে তোমার কাছে ক্ষমাও চেয়ে যাবে। আর কোনও গণ্ডগোল হবে না, আমি কথা দিচ্ছি।

মাত্র কুড়ি টাকা?

হ্যাঁ।

উঃ, কী যে ভয়ে ভয়ে আছি!

কোনও ভয় নেই।

পাঁচ মিনিটের জন্য ভিতরে আসবে না?

আজ থাক মউ। পরে আসব। চলি।

হাতটা একবার তুলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল বুলু।

পুরো দৃশ্যটা মন প্রাণ হৃদয় আর চোখ দিয়ে দেখল দীয়া। বুলুদা যখন এ পাড়া ছেড়ে চলে যায় তখন তার বয়স তেরো-চোদ্দো। মনে আছে একবার শিবরাত্রির উপোস করে সে বুলুদার নাম করে শিবের মাথায় জল ঢেলেছিল। আর জল ঢালতে গিয়ে নিজের কাছে নিজেই লজ্জায় মরে গিয়েছিল সে। মানুষটা চলে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে মনে পলিমাটি পড়ে গিয়েছিল তার। আজ আবার যেন ঢেউয়ের ধাক্কায় পলিমাটি ধুয়ে গেল হঠাৎ। এবার সে কী করে? কী করে?

মুখোমুখি দুই ফ্ল্যাটের দুই দরজায় বিদিশা আর মউ।

তোমারও কি ফিলজফিতে অনার্স ছিল মউ?

হ্যাঁ বিদিশাদি। আমাদের খুব বন্ধুত্বও ছিল।

বিদিশা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ওর কপালটাই খারাপ। অনার্স আর এম.এর রেজাল্ট ভাল করতে পারল না ওর বাবা আর মায়ের জন্য। বাবার সম্পত্তি সব উড়ে পুড়ে গেল। ট্যাক্সি ড্রাইভার হওয়ার কথা তো ওর নয়।

সুমিত কিন্তু ওরকমই। যতদূর বুঝেছি ও আর পাঁচজনের মতো নয়। বড্ড পাগল।

হ্যাঁ মউ। ওকে আমরাও পাগলাই বলি।

একটা ছেলে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠে আসছিল। একগাল হেসে মউকে এসে বলল, সরি বউদি, খুব ভুল হয়ে গেছে। আমাদের মাফ করে দেবেন।

মউ অবাক চোখে চেয়ে রইল।

ছেলেটা বলল, চাঁদা নিয়ে ঝুটমুট একটু ঝামেলা হয়ে গেছে। কিছু মাইন্ড করবেন না।

অভিমানে মউয়ের ঠোঁট একটু কেঁপে উঠল। বলল, ওরকম গালাগাল কেন দিলে তোমরা?

আমাদের কি মুখের কোনও লাগাম আছে বউদি। দিনরাত ওসব কথাই সবাই বলছে এখানে। প্লিজ গায়ে মাখবেন না। পরে দেখবেন, এ পাড়ার ছেলেরা কিছু খারাপ নয়। কোনও বিপদ-আপদ হলে ডাকবেন, জান লড়িয়ে দেব।

ঠিক আছে, দাঁড়াও। আমি টাকা নিয়ে আসছি।

বুলুদা বলে দিয়েছে কুড়ি টাকা।

তাতে খুশি তো তোমরা?

আরে বুলুদা যা বলবে তাই। রসিদটা নিয়ে আসবেন কেটে অ্যামাউন্টটা বসিয়ে দেব।

টাকা নিয়ে রসিদ দিয়ে ছেলেটা চলে যাওয়ার পর বিদিশা বলল, দেখলে তো!

মউ বুকে হাত দিয়ে একটা বড় শ্বাস ছেড়ে হেসে ফেলে বলল, বাবা, বাঁচলাম।

এ সব চোখ ভরে দেখছে দীয়া। এইরকমই ছিল বুলুদা। পাড়ার সবাই একবাক্যে মানত। বুলুদা যা বলবে তাই হবে। তা বলে মারদাঙ্গা, গুন্ডামি করেনি কখনও। কিন্তু সবাই ভালবাসত। মেনেও চলত, পার্টির লোকেরা অবধি।

দীয়া খুব সংকোচের সঙ্গে বলল, আমি আসছি।

বিদিশা মউয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দরজা থেকে ফিরে তাকিয়ে বলল, ওমা! তোকে আটকে রেখেছি বুঝি! একটু ভেবে দেখিস লক্ষ্মীটি। বুলু যাই বলুক, আমরা কিন্তু তোকে মেয়ের মতো দেখব।

দীয়া মৃদু স্বরে বলল, মাকে বলবখন।

ঘরে এসে দীয়া একটু আয়না নিয়ে বসল। নিজের চোখ দিয়ে নিজেকে কি ভাল করে দেখা যায়? কিছুই বোঝা যায় না। তবু দীয়া তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। মুখ টিপে একটু হাসেও।

বুড়ু-বিশু এ সময় ঘরে থাকে না। হয় খেলছে, না হয় পুজোর প্যান্ডেলে আটকে আছে। বাবা ফেরেনি। মা বেরিয়ে গেছে কাজে। এই সময়টায় বড্ড একা সে। একাই ভাল। আজ একটু একা থাকতেই ইচ্ছে করছে তার।

এই দীয়া, আজ ফাংশনে যাবি না?

জানালায় হেনা।

কীসের ফাংশন?

বাঃ, আজ পুজো প্যান্ডেলে ফাংশন হবে না? বড় বড় সব আর্টিস্ট

আসছে।

ফাংশন মানে চালু হিন্দি ছবির গান। অনেক হ্যাতান্যাতা আর্টিস্ট বড় বড় প্লে ব্যাক গায়ক গায়িকার গলা নকল করে গায়। মাইকে সারা দিন যেসব গান বাজছে সেগুলোই ফের গাইবে। সেই ফাংশনে এত ভিড় হয় যে দম বন্ধ হওয়ার জোগাড়।

দীয়া বলল, না রে, রাত জাগলে ভীষণ শরীর খারাপ লাগে।

যাঃ। তুই যেন একটা কী!

ঠিক কথা, দীয়া আর পাঁচজনের মতো নয়।

কাজটা নিলি না তো!

দীয়া মাথা নেড়ে বলে, না। মা নিতে দেবে না।

ওরা ভাল টাকা দিত কিন্তু।

জানি।

তোকে নাকি খুব পছন্দ হয়েছিল। বেশি টাকা চাইলেও দিত।

দীয়া বলল, না।

বুলুদার গাড়িতে আমরা সব গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাচ্ছি। যাবি?

অবাক হয়ে দীয়া বলে, বুলুদার গাড়িতে?

হ্যাঁ। বুলুদা এখন ক্লাবে আড্ডা মারছে। পল্টন গাড়ি চালাবে। বুলুদাই বলল, যা ওদের নিয়ে একটু বেড়িয়ে আয়। যাবি?

দীয়া ফের মাথা নাড়ল, না। আমার কত কাজ পড়ে আছে।

তুই যেন একটা কী।

দীয়া একটু হেসে বলে, একদিন গাড়ি চড়ে কী লাভ?

একদিনই কে চড়াচ্ছে বাবা! গঙ্গার ধারে তো যাসনি। ভারী ভাল জায়গা। জাহাজ টাহাজ দেখা যায়।

না, যাবে না দীয়া। দূরের জাহাজ দেখে তার কী লাভ? যত আশা আর আকাঙ্ক্ষা ছিল তার সব ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে। ষোলো বছরে পা, তবু যেন মনে হয়, বয়স হয়ে গেল কত!

॥ চার ॥

মাপ করবেন, একটু ডিস্টার্ব করছি।

আর কিছু জানতে চান? যা বলার পুলিশকে তো বলেছি।

তদন্তটা নতুনভাবে করতে হচ্ছে, আমি গোয়েন্দা পুলিশের লোক।

হ্যাঁ, শুনেছি, বলুন।

আপনার এখন শোকের সময়। কিন্তু আমারও উপায় নেই।

ভদ্রমহিলা ছিপছিপে এবং লম্বা এবং কালো, বয়স মধ্য পঞ্চাশ। চোখেমুখে বুদ্ধির ছাপ আছে। একটু হেসে বললেন, শোক তো আছেই। কিন্তু এভাবে কেন মারা গেলেন, কে মারল সেটাও জানা দরকার। আপনি যা জানতে চান বলুন।

ওঁর বয়স কত হয়েছিল?

সাতষট্টি-আটষট্টি হবে।

স্ট্রং অ্যান্ড স্টাউট ছিলেন কি?

না। ওঁর ব্লাড সুগার আর হাই প্রেসার ছিল। তবে মনের জোর ছিল খুব। সম্প্রতি লক্ষ করতাম খুব অন্যমনস্ক থাকছেন।

উনি তিনটে কোম্পানি চালাতেন। তার মানে খুব প্র্যাকটিক্যাল লোক, তাই না?

তিনটে কোম্পানি শুনতে যত ভাল, কাজে তা নয়। ওর তিনটে ছোট ছোট কারখানা ছিল। হাওড়ায় একটা আয়রন ফাউন্ড্রি আছে, আর সেইটিই ছিল মেন সোর্স অফ ইনকাম, টিটাগড়ে একটা প্লাইউড ফ্যাক্টরি আছে। আর ইদানীং একটা প্লাস্টিক মোল্ডিং কারখানা করেছিলেন।

আপনি কি এসব কারখানার সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত ছিলেন বা আছেন?

আমার একটা বুটিকের দোকান আছে। সেটা নিয়েই আমি ব্যস্ত থাকি।

আপনাদের তো ছেলে নেই?

না, একটা মেয়ে। তার বিয়ে হয়ে গেছে। দিল্লিতে থাকে।

তা হলে এসব কারখানার দেখাশোনা উনি একাই করতেন?

হ্যাঁ। এক ভাইপো আছে, সুকান্ত। সে ওঁর ম্যানেজার। আর কর্মচারীরা আছে।

ওঁর মৃত্যুর পর এসব কে চালাবে কিছু ভেবেছেন?

সুকান্ত হাওড়ার কারখানা চালাচ্ছে। অন্য দুটো ফ্যাক্টরিও চলছে। লোকসান দেখলে বিক্রি করে দেব।

আপনার বুটিকের দোকানটা কোথায়?

হিন্দুস্থান পার্কে।

ভালই চলে?

মোটামুটি ভালই।

একটা সেনসিটিভ প্রশ্ন করছি।

করুন না।

যতদূর জানি, সীতানাথবাবু একসময় রাইটার্সে কাজ করতেন। তখন আপনাদের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। তাই না?

ঠিকই জেনেছেন।

সীতানাথবাবু ব্যবসা শুরু করেন বাহান্ন-তিপ্পান্ন বছর বয়সে। তাই না?

হ্যাঁ।

নতুন ভেনচার শুরু করার পক্ষে বয়সটা একটু বেশি বলে কি আপনার মনে হয় না?

ভদ্রমহিলা একটু থমকে গেলেন, তারপর বললেন, হ্যাঁ। সেটা তো অনেকে ভাবতেই পারে। কিন্তু উনি খুব শক্ত মনের মানুষ ছিলেন। কিছু একটা করবেন বলে বরাবর জেদ ছিল।

কিন্তু বয়সটা?

আপনি যা-ই বলনু, বাহান্ন-তিপ্পান্ন বছর বয়সকে আমার খুব বেশি বয়স বলে মনে হয় না কিন্তু।

হ্যাঁ, ও ব্যাপারটা রিলেটেড। কিন্তু আমাদের যেটুকু জানা আছে তা হল আয়রন ফাউন্ড্রি চালানোর কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা ওঁর থাকার কথা নয়। তবু উনি হঠাৎ একটু বেশি বয়সে একটা ফাউন্ড্রি কিনে ফেললেন। রিস্ক ফ্যাক্টর সত্ত্বেও। এটা একটু অস্বাভাবিক নয় কি?

আমি ওঁকে বারণ করেছিলাম। উনি শোনেননি। বলাইবাবু আমাদের পুরনো বন্ধু। পারিবারিক বন্ধু বলা যায়। ফাউন্ড্রিটা তাঁর। বলাইবাবুর কোনও সন্তান ছিল না। বয়স হয়ে যাওয়ায় উনি পণ্ডিচেরি চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কারখানাটা উনি আমার স্বামীর কাছে বিক্রি করে দেন। কারখানা চালানোর কায়দাকানুন উনিই আমার স্বামীকে শিখিয়ে গিয়েছিলেন। কেনার আগে এক বছরেরও বেশি আমার স্বামী নিয়মিত গিয়ে ওই কারখানার কাজকর্ম দেখতেন।

কারখানা চালাতে শেখাই তো বড় কথা নয়, মার্কেটিং থেকে শুরু করে আরও অনেক ব্যাপার আছে যা এক বছরে শিখে ওঠা খুব শক্ত।

আমি তো অত জানি না। তবে আমার স্বামী কারখানা কিনে কিন্তু ভালই চালাতেন। চাকরিটা ছেড়ে দেন এবং কয়েক বছরের মধ্যেই

আমাদের আর্থিক অবস্থার বেশ উন্নতি হয়।

হ্যাঁ, বিস্ময়কর উন্নতি।

দেখুন, কলকারখানার ব্যাপার আমি ভাল বুঝি না। আমার স্বামীর সঙ্গে ওসব নিয়ে কথাও হত না। তবে দেখেছি, উনি উদয়াস্ত খাটতেন। খেটেই ব্যবসা দাঁড় করিয়েছিলেন। পরে আরও দুটো কারখানা করেন।

হঠাৎ এত আর্থিক উন্নতি করার দিকে ওঁর ঝোঁক কেন চাপল তা বলতে পারেন?

উনি কেরানিগিরিতে খুব একটা খুশি ছিলেন না। প্রায়ই বলতেন এরকম সাধারণ জীবন কাটাতে ওঁর ভাল লাগে না।

আয়রন ফাউন্ড্রি কিনতে অনেক টাকার দরকার হয়েছিল। টাকাটা উনি কোথায় পেলেন জানেন?

জানি। মধ্যবিত্তের পক্ষে কারখানা কেনা তো সহজ নয়। উনি ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়েছিলেন। তা ছাড়া আমার গয়নাগাটি যা ছিল সেগুলো বিক্রি করতে হয়।

আপনি কি বড়লোকের মেয়ে?

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

জানতে চাইছি বিয়েতে কি আপনি অনেক গয়না পেয়েছিলেন?

মোটামুটি।

কত ভরি হবে?

ঠিক মনে নেই।

আন্দাজ করেই বলুন না।

বিশ-পঁচিশ ভরি।

সেটা তো বেশ বেশিই, তাই না?

ভদ্রমহিলা চুপ করে রইলেন।

ব্যাঙ্ক থেকে উনি কত লোন পেয়েছিলেন জানেন?

না। জানি না। বলেছি তো, কলকারখানার ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে আমার কথা হত না। তবে আমি আপত্তি করেছিলাম।

ব্যাঙ্ক লোনের সবটাই কি শোধ হয়ে গেছে?

তা জানি না।

ব্যাঙ্ক লোনের কোনও রেকর্ড আছে কিনা জানেন?

ওঁর ফাইলপত্রে থাকতে পারে। খুঁজে দেখতে হবে।

প্লিজ, খুঁজবেন। ব্যাপারটা জরুরি, আমাদের আরও জানা দরকার সেই লোনের গ্যারান্টার কে ছিল। আপনি কি তাও জানেন না?

না। আমার ওসব জানা নেই।

আপনার স্বামী কি আপনার মতামতকে মূল্য দিতেন না?

তা কেন?

আপনার কথা থেকেই মনে হচ্ছে উনি ওঁর ব্যবসার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কোনও কথাই বলতেন না। সাধারণত স্বামীরা স্ত্রীর সম্পূর্ণ অজান্তে তো কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন না।

লোহালক্কড়ের ব্যাপারে আমার ইন্টারেস্ট নেই বলেই আমি এ নিয়ে ওঁর সঙ্গে আলোচনা করতাম না। তাই অনেক কিছুই আমার জানা নেই।

আপনার সঙ্গে সীতানাথবাবুর সম্পর্ক কেমন ছিল?

ভালই।

কীরকম ভাল? আপনারা মনের দিক দিয়ে খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন কি?

অত জানি না। তবে সম্পর্ক খারাপ ছিল না।

খারাপ, ভাল বা নিস্পৃহ অনেকরকম সম্পর্ক হতে পারে। আপনাদের সম্পর্ক নিস্পৃহ ছিল কি?

আসলে ওঁর আর আমার জগৎ একটু আলাদা ছিল। আমি একটু আর্টিস্টিক টাইপের, উনি টাকা রোজগারের দিকে বেশি আগ্রহী ছিলেন।

তাতেও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে আটকায় না। দুরকম স্ফিয়ারের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনেক সময়ে চমৎকার দাম্পত্য সম্পর্ক থাকে।

আমাদের সম্পর্ক খারাপ ছিল একথা বলিনি তো। বরং উলটোটাই বলতে চাইছি।

সীতানাথবাবু কি আপনাকে যথেষ্ট সময় দিতে পারতেন?

তা কী করে পারবেন? উনিও ব্যস্ত, আমিও ব্যস্ত।

সীতানাথবাবুর বিজনেস অ্যাসোসিয়েটদের সম্পর্কে আপনার কোনও ধারণা আছে কি?

না, বাড়িতে খুব কম লোকই আসত। বেশিরভাগ ক্লায়েন্ট বা অ্যাসোসিয়েটসদের সঙ্গে ওঁর দেখা হত অফিসে বা কোনও পার্টিতে।

সেইসব পার্টিতে আপনি কখনও গেছেন?

না। পার্টিতে যেতে আমার ভাল লাগে না।

সিঁথিতে আপনাদের কোনও আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধব আছে কি?

না। সেকথা পুলিশকে বলেছি।

ভাল করে ভেবে দেখেছেন? অনেকসময় অনেক রিমোট আত্মীয়স্বজনের কথা আমরা ভুলেই যাই।

আমার তো মনে পড়ে না।

সেদিন—অর্থাৎ ঘটনার দিন ওঁর সঙ্গে একজন মহিলা এবং একজন পুরুষ ছিলেন। তাঁদের যে বিবরণ পাওয়া গেছে তা স্পষ্ট নয়। আপনি কি বলতে পারেন ওরকম দুজনের ওঁর সঙ্গে থাকা স্বাভাবিক কিনা।

না।

বিবরণ শুনে কাউকে চেনা চেনা ঠেকছে কি?

না।

আপনাদের কটা গাড়ি?

দুটো। একটা মারুতি, একটা ইন্ডিকা। মারুতিটায় উনি চড়তেন। ইন্ডিকাটায় আমি।

সেদিন উনি গাড়ি নেননি, কেন তা জানেন?

না। গাড়ি নিয়েই উনি সেদিন বেরিয়েছিলেন। তবে ড্রাইভারকে দিয়ে গাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দেন। কেন তা জানি না।

ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?

সে তো করেছিই। পুলিশও তো ওকে জেরায় জেরায় ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। তবে ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়, উনি প্রায়ই গাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিতেন।

কেন?

ওঁর একটা মানসিক ব্যাপার ছিল। নিজের গাড়িতে চড়তে উনি অস্বস্তি বোধ করতেন। ওঁর ভয় ছিল, গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করলে বা খারাপ হলে উনি বিপদে পড়বেন। ওঁর একটা টেনশন হত সেইজন্য। তাই খুব ঘিঞ্জি এলাকায় বা দূরে কোথাও যেতে হলে উনি ট্যাক্সি নিতেন বা গাড়ি ভাড়া করতেন কিংবা অন্য কারও গাড়িতে যেতেন।

নিজে গাড়ি চালাতেন কি কখনও?

না না, উনি শেখেননি, ভয় পেতেন। সবচেয়ে বেশি ভয় পেতেন কাউকে চাপা দেওয়ার।

খুব ভীতু লোক ছিলেন কি?

ওই একটা ব্যাপারকে খুব ভয় পেতেন।

এবার একটা প্রশ্নের জবাব একটু ভেবে দিন।

বলুন।

লাট্টুরাম নামে কারও কথা জানেন কি?

না তো!

খুব ভাল করে ভেবে বলুন। ব্যাপারটা ইম্পর্ট্যান্ট।

না, মনে পড়ছে না, কে সে?

সীতানাথবাবুর মুখে কখনও নামটা শোনেননি?

মনে পড়ছে না।

নামটা কি আপনি আমার কাছেই প্রথম শুনলেন?

হ্যাঁ।

সীতানাথবাবুর ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে আপনার কখনও কোনও সন্দেহ দেখা দেয়নি?

না। কীসের সন্দেহ?

ওঁর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স সম্পর্কে আপনার কোনও আইডিয়া আছে কি?

ও নিয়ে কথা হত না। তবে টাকাপয়সার অভাব ছিল না, এটুকু বলতে পারি।

সীতানাথবাবুর ভাইপো সুকান্ত কেমন মানুষ?

দেখুন, সুকান্তকে পুলিশ খুব হ্যারাস করেছে। কিন্তু সুকান্ত অত্যন্ত নিরীহ ছেলে। একটু বোকাও। ওকে দেখলেই বুঝতে পারবেন সাতে পাঁচে থাকে না। ওর বাবা বেঁচে নেই। জ্যাঠাকেই বাবার মতো দেখত।

আপনি তা হলে সুকান্তকে অপছন্দ করেন না?

না। একেবারেই না। ওর মা-ও খুব ভালমানুষ। ওরা খুব ধর্মভীরুও।

কেউই সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়।

আপনারা তো ট্যাক্সিওয়ালাটাকে ধরেছিলেন। তার কী হল?

তাকে প্রমাণাভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

সে কী? সেই তো প্রাইম সাসপেক্ট!

পুলিশ তার বিরুদ্ধে কেস সাজাতে পারেনি। প্রমাণ নেই।

তা হলে কী হবে?

কিছু হবে। আপনি চিন্তা করবেন না। আমরা আবার লাটুরামের কথায় ফিরে আসি।

কিন্তু তাকে তো আমি চিনি না। সে কে?

সে কে তা জানাটা খুব দরকার।

কিন্তু আমি তো সে ব্যাপারে সাহায্য করতে পারছি না।

যোধপুর পার্কের এই বাড়িটা ছাড়া আপনাদের আর কোথাও কোনও প্রপার্টি আছে কি?

আছে। ঝাড়গ্রামে একটা বাগানবাড়ি আছে।

মাঝে মাঝে কি সেখানে যেতেন আপনারা?

প্রতিবছর পুজোর সময় যেতাম।

কত বড় বাড়ি?

দু বিঘে জমি নিয়ে বাগান। বাড়িটা খুব বড় নয়। ছোট দোতলা।

কেয়ারটেকার আছে?

আছে।

আর কোথাও কোনও সম্পত্তি নেই?

না।

এবার খুব অস্বস্তিকর একটা প্রশ্ন। দয়া করে প্রশ্নটা শুনে রেগে যাবেন না, এতক্ষণ আপনি চমৎকার কোঅপারেট করেছেন।

বলুন না।

সীতানাথবাবুর কি টাকাপয়সা হওয়ার পর কোনও চারিত্রিক দোষ দেখা দিয়েছিল বলে সন্দেহ হয় আপনার?

ভদ্রমহিলা একটু হাসলেন। বললেন, মদ মেয়েমানুষ তো?

হ্যাঁ, সেকথাই বলছি।

ড্রিংক কখনওসখনও করতেন। কখনও বেসামাল হতে দেখিনি। না, মদের নেশা ওঁর ছিল না।

আর মহিলাঘটিত ব্যাপার?

পুলিশও আমাকে এ প্রশ্ন করেছে।

হ্যাঁ। আপনি নেগেটিভ জবাব দিয়েছিলেন।

সেই জবাব যদি আপনাকেও দিই?

শবর একটু হাসল। বলল, তা তো দিতেই পারেন। কিন্তু মানুষটা যখন আর বেঁচে নেই তখন তাঁর সম্পর্কে লুকোছাপা করে লাভ কী?

ভদ্রমহিলা একটু চুপ করে থেকে বললেন, সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হবে, আমি জানি না। উনি অনেক সময়েই অনেক রাত করে ফিরতেন। কখন ফিরতেন তা আমি টেরও পেতাম না।

আপনারা কি এক ঘরে শুতেন?

না। আমাদের ঘর আলাদা ছিল।

তারপর বলুন।

ওই তো বললাম। আমি ঠিক জানি না।

কোনও সন্দেহ হত কি? কিংবা কখনও এমন কোনও কিছু দেখেছেন কি যাতে সন্দেহ হতে পারে? ধরুন টেলিফোন কল, উড়ো খবর, চিঠি বা নোট কিংবা লিপস্টিকের দাগ বা যা হোক কিছু?

না। ওসব নয়।

কিন্তু আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি কিছু একটা বলতে চাইছেন, কিন্তু সংকোচবশে বলতে পারছেন না।

ভদ্রমহিলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, একটা ঘটনা ঘটেছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা ওঁর অবস্থা ভাল্‌ হওয়ার পরে নয়। বরং অনেক আগে।

কী হয়েছিল?

ওঁর বয়স তখন চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। ওঁর এক বন্ধু ছিল, সুব্রত দাশগুপ্ত। ওঁরই বয়সি। সেই সুব্রতর একটি মেয়ে ছিল। তার নাম রুমকি। মেয়েটির বয়স তখন ষোলো-সতেরোর বেশি নয়। উনি সেই মেয়েটির প্রেমে পড়ে যান।

বন্ধুর মেয়ের?

হ্যাঁ। খুবই ঘেন্নার কথা।

কী হয়েছিল?

সে একটা কেচ্ছা। উনি মেয়েটির সঙ্গে রাস্তায়ঘাটে দেখা করতেন।

মেয়েটিও কি ওঁর প্রতি আসক্ত ছিল?

হ্যাঁ। টিন এজার মেয়ে, একজন পুরুষ স্তাবক পেয়ে হয়তো মাথা ঘুরে গিয়ে থাকবে।

তারপর?

দুই পরিবারে জানাজানি হওয়ার পর খুব অশান্তি হয়।

ফিজিক্যাল রিলেশন হয়েছিল কি?

তা কি আর হয়নি! উনি মেয়েটিকে নিয়ে তিন দিনের জন্য দীঘায় পালিয়ে গিয়েছিলেন, ধরা পড়ার পর সুব্রতবাবু তো মেয়েকে মেরেই ফেলতে চেয়েছিলেন।

পুলিশ কেস হয়নি?

না। সেটা ওঁরা করেননি। মেয়ের তো ভবিষ্যৎ আছে। তবে দুই পরিবারের সম্পর্ক আর রইল না।

এই ঘটনার ফলে আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন ছিল?

ভদ্রমহিলা হাসলেন, যেমন হওয়ার কথা। অনেকদিন সম্পর্ক ছিল না। আমি বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলাম।

কতদিন সম্পর্ক বন্ধ ছিল?

বছর দেড়েক।

ডিভোর্সের মামলা করেননি তো?

না। আমার মা-বাবা আমাকে বুঝিয়েছিলেন, এরকম পদস্খলন হওয়া বিচিত্র নয়, হয়তো পরে অনুতাপ আসবে।

সেটা কি এসেছিল?

হ্যাঁ। প্রথম বছরখানেক উনি আমার মুখোমুখি হননি ভয়ে। তবে চিঠি

লিখে ক্ষমা চাইতেন। তাতে লিখতেন, মেয়েটাই ওঁকে নষ্ট করেছে।

তারপর?

বছরখানেক পর থেকে উনি আমার কাছে আমার বাপের বাড়িতে যাতায়াত করতে শুরু করেন। কান্নাকাটি, পায়ে ধরা, নাকে খত দেওয়া সবই করেছেন, শেষ অবধি আমি ফিরে আসি।

আপনি একজন মহান মহিলা।

তা কে জানে।

সেই মেয়েটির এখন কোনও খবর জানেন?

বিয়ে হয়েছিল শুনেছি, কলকাতায় কোথাও হয়তো আছে।

আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি আরও কিছু বলতে চাইছেন। পারছেন না, রুচিতে বাধছে কি?

ভদ্রমহিলা ম্লান একটু হাসলেন। বললেন, আপনি একজন মজার গোয়েন্দা তো! হ্যাঁ, আমার কিছু বলার আছে।

কী সেটা?

যা বলছি তা নিতান্তই সন্দেহ। ফ্যাক্ট নাও হতে পারে।

তবু বলুন। সন্দেহ থেকে কত কী বেরোয়।

আমার মনে হয় কোনও দিনই উনি রুমকির প্রেম থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি।

কেন মনে হয় একথা?

বললাম তো, আমার সন্দেহ অমূলকও হতে পারে। কিন্তু স্ত্রীরা স্বামীর অনেক মনের কথা জানতে পেরে যায়।

হ্যাঁ হতেই পারে।

আমার মনে হয় রুমকিকে না পেয়ে উনি ভিতরে ভিতরে ভীষণ অস্থিরতায় ভুগতেন। আর ওঁর জীবনে যে নতুন অ্যাডভেঞ্চার দেখা দিল তার পিছনেও আছে রুমকিকে নিয়ে ওর ফ্রাস্ট্রেশন। উনি ওঁর শূন্যতাটা অন্যভাবে ভরাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাই ওই ব্যবসায় নামা, কাজ নিয়ে মেতে থাকা, নইলে সত্যিই বাহান্ন-তিপ্পান্ন বছর বয়সে কেউ নিজের ছকবাঁধা জীবনের খোলনলচে পালটে ফেলার চেষ্টা করে না।

রুমকির সঙ্গে ওঁর পরে কি আর সম্পর্ক ছিল?

বোধহয় না। কারণ রুমকির খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেন সুব্রতবাবু।

রুমকি কীরকম মেয়ে ছিল?

দেখতে খারাপ ছিল না। কেন যে বাপের বয়সি একজনকে নিয়ে মাতল সেটা আমি আজও বুঝতে পারি না।

সীতানাথবাবু বেশ হ্যান্ডসাম ছিলেন, তাই না?

হ্যাঁ, তা ছিলেন। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে ওঁকে নিতান্তই ছোকরার মতো দেখাত। কিন্তু তবু রুমকি তো জানত লোকটা তার বাবার বন্ধু।

রুমকির ওপর আপনার রাগ নেই?

এখন নেই। কিন্তু তখন তো নিশ্চয়ই ছিল।

কার সঙ্গে রুমকির বিয়ে হয়েছিল জানেন?

শুনেছি একজন ডাক্তারের সঙ্গে।

আর কিছু নয়?

না। কিন্তু এই মামলায় এসব খবর কি কোনও কাজে লাগবে?

কোনটা যে কোন কাজে লাগে তা কে বলতে পারে?

আপনি একটু চা বা কফি খাবেন কি?

না না। অন ডিউটি একজন অফিসারকে এন্টারটেইন না করাই ভাল।

ওমাঃ তা কেন? পুলিশের লোক বলে কি আর মানুষ নন?

অনেকে ঠিক তাই ভাবে।

অন্যে ভাবুক। আমি ওরকম ভাবি না।

চা বা কফির চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন এখন ইনফর্মেশনের।

আরও কিছু জানতে চান?

হ্যাঁ, লাট্টুরাম নামে যার কথা আপনাকে বলছিলাম।

হ্যাঁ। সে কে?

সীতানাথবাবুর জীবনের হঠাৎ যে ট্রান্সফর্মেশনটা হয়, অর্থাৎ চাকরি ছেড়ে যে উনি ব্যবসাতে নামেন তার পিছনে এই লাট্টুরাম নামে লোকটার অবদান কিন্তু অনেক।

কই, এরকম কারও কথা শুনিনি তো!

আপনার স্বামীর বয়স যখন বাহান্ন-তিপ্পান্ন তখন লাট্টুরামের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ।

কিন্তু লাট্টুরামের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী? তার কথা উঠছেই বা কেন?

বলছি। তার আগে একটা কথা বলুন, বলাইবাবু পণ্ডিচেরি চলে যাওয়ার পর তাঁর আর কোনও খবর কি আপনারা পেয়েছিলেন?

না। কারখানা বিক্রি করার পর আর ওঁকে দেখিনি।

উনি যে পণ্ডিচেরিতেই গিয়েছিলেন তা কি নিশ্চিত জানেন?

না। কিন্তু ওঁর মুখেই শুনেছিলাম উনি সেখানে চলে যাবেন।

তার মানে বলাইবাবুর কোনও খবরই আপনি জানেন না?

না।

উনি বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান ছিলেন, তাই তো?

হ্যাঁ। সেইজন্যই সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে শেষ জীবনটা শান্তিতে কাটাবেন বলে চলে যেতে চেয়েছিলেন।

আপনি কি জানেন যে, বলাইবাবু কোনও দিনই পণ্ডিচেরি পৌঁছোতে পারেননি?

না তো! উনি তা হলে কোথায় গেলেন?

কারখানা হস্তান্তরের দিনই রাতে উনি ছাদ থেকে পড়ে মারা যান। পুলিশের রেকর্ডে মৃত্যুটা আত্মহত্যা বলে লেখা আছে।

ইস্! এঃ মা! আমি তো কিছুই জানি না!

সীতানাথবাবু আপনাকে তা হলে ঘটনাটা বলেননি?

না তো! এ খবরটা তো আমাকে জানানো ওঁর খুবই উচিত ছিল! উনি আমাদের বেশ ঘনিষ্ঠ মানুষই ছিলেন। মাঝে মাঝে আসতেন, পায়েস খেতে খুব ভালবাসতেন বলে আমি ওঁকে মাঝেমধ্যে পায়েস করে খাওয়াতাম। আত্মহত্যা করার মতো কী হয়েছিল ভদ্রলোকের?

তাঁর আত্মহত্যা আর কারও পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কার পক্ষে?

সীতানাথবাবুর পক্ষে। কারণ বলাইবাবু যেদিন কাগজপত্রে সই করে ফাইনালি কারখানাটি সীতানাথবাবুর হাতে তুলে দেন সেদিন রাতেই তিনি ছাদ থেকে পড়ে মারা যান।

এতে কী সুবিধে হয়েছিল?

এটা আমার অনুমান। সম্ভবত সীতানাথবাবু ওঁকে একটা অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক দিয়েছিলেন। আরও অনুমান সেই চেকটি বলাইবাবু ব্যাংকে জমা দেওয়ার সময় পাননি।

তার মানে?

সীতানাথবাবুর অনেক টাকা বেঁচে গিয়েছিল।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু হয়তো তাতে আপনার একটু মানসিক কষ্ট হবে।

একটু বুঝিয়ে বলুন।

আমি সন্দেহ-পিশাচ পুলিশ। সুতরাং বলাইবাবুর মৃত্যুটাকে একটা নিছক আত্মহত্যার ঘটনা বলে মেনে নিতে পারিনি। কারণ যিনি কিছুদিনের

মধ্যেই শান্তিতে বাকি জীবনটা কাটাবেন বলে দূরে চলে যাচ্ছেন তাঁর পক্ষে হঠাৎ সুইসাইডের সিদ্ধান্ত নেওয়াটা অস্বাভাবিক।

তাই তো! তা হলে কী হয়েছিল?

সম্ভবত বলাইবাবুকে ছাদ থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

ও মা গো! কে করল এ কাজ?

লাট্টুরামকে আপনি চেনেন না তো!

না। মনে পড়ছে না।

লাট্টুরাম একজন প্লাম্বার। কলের মিস্ত্রি। গোবিন্দপুর বস্তিতে থাকে। তাকে দেখলে কিছুতেই বুঝতে পারবেন না যে, তার একটা গুপ্ত প্রতিভা আছে।

সেটা আবার কী?

লাট্টুরাম একজন হত্যাশিল্পী।

সে আবার কী? জন্মে শুনিনি তো! কী শিল্পী বললেন?

মার্ডার আর্টিস্ট।

বাবা গো! খুনি নাকি?

হ্যাঁ, তবে আর পাঁচজন সাধারণ খুনির মতো নয়। খুন করার নিখুঁত পরিকল্পনার জন্যই সে বিশেষ মহলে পরিচিত। তার খুনকে খুন বলে ধরাই যায় না। দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা বা রহস্যময় রোগে মৃত্যু বলে মনে হয়। গত বিশ বছরে যে কটা খুন সে করেছে তার একটাতেও পুলিশ তাকে ধরতে পারেনি। বার দুই ধরা পড়লেও প্রমাণাভাবে খালাস পেয়ে যায়।

পুলিশ জানে?

জানে বললে ভুল হবে। পুলিশ সন্দেহ করে। কিন্তু তার অ্যালিবাই সাক্ষ্যপ্রমাণ ইত্যাদি খুবই স্ট্রং। পুলিশ সন্দেহের বশে তার ওপর নজর রেখে রেখে হয়রান হয়ে গেছে।

কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক?

আপনাদের বাড়িতে কোনও কলের মিস্ত্রি আসে না?

কেন আসবে না? আমাদের মিস্ত্রি অক্ষয়। সে ওসব হত্যাশিল্পীটিল্পী নয় বাপু। সে ভাল লোক।

লাট্টুকে দেখলেও আপনার ভাল লোক বলে মনে হবে। সরল, সহজ মুখ, মুখে হাসি, ভারী বিনয়ী।

বললেন তো পুলিশ সন্দেহ করে। এমন তো হতে পারে যে সন্দেহটা অমূলক!

তা হতেই পারে। শুধু সন্দেহের বশে তার বদনাম করা হয়তো ঠিক

হচ্ছে না। তবু আপনার জানা দরকার এই লোকটির সঙ্গে সীতানাথবাবুর বেশ ভাবসাব ছিল।

আপনি কি কিছু ইঙ্গিত করছেন?

বলাইবাবু অনেক দিন আগে মারা গেছেন। মারা যাওয়ার পর তাঁর ঘর এবং জিনিসপত্র পুলিশ সিল করে দেয়, কারণ তাঁর কোনও ওয়ারিশান ছিল না। দূর সম্পর্কের দুই ভাগ্নে দাবিদার হয়ে মামলা মোকদ্দমা করেছিল। সেই মামলা এখনও মেটেনি। সীতানাথবাবু যে অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেকটা বলাইবাবুকে দিয়েছিলেন তাও কখনও ক্যাশ হয়নি। এসব জেনে এখন আর কোনও লাভ নেই বটে, কিন্তু আমার সন্দেহ, বলাইবাবুর মৃত্যুর পেছনে হাত ছিল লাট্টুরামের।

লাট্টুরাম কি ওঁকে ছাদ থেকে ফেলে দিয়েছিল?

হয়তো। আমরা খুব নিশ্চিত নই।

শিয়োর না হয়ে বলছেন কী করে?

আপনি রেগে যাচ্ছেন না তো?

না। তবে উত্তেজিত হচ্ছি।

এসব আনঅফিসিয়ালি বলা। সীতানাথবাবু হয়তো লাট্টুরামকে বলাইবাবুর বাড়ির কল সারাইয়ে লাগিয়েছিলেন। লাট্টু ও বাড়িতে যেত। তারপর মোক্ষম দিনে—

না না, এটা বড্ড আষাঢ়ে গল্প হয়ে যাচ্ছে। উনি অর্থাৎ আমার হাজব্যান্ড ওরকম মানুষ ছিলেন না।

আপনার কথা সত্যি হতেই পারে। তবে হাওড়ায় কারখানা কেনার বছর দুয়েকের মধ্যে সেই কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে সীতানাথবাবুর যে গন্ডগোল হয়েছিল সেটা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে!

হ্যাঁ। কারখানায় গন্ডগোল তো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

এই গন্ডগোলটা একটু ঘোরালো ছিল। নবেন্দু বলে একজন খুব তেড়িয়া এমপ্লয়ি ছিল যার লিডারশিপে কারখানায় গন্ডগোলটা পাকিয়ে ওঠে। সীতানাথবাবু তাদের হাতে একবার হেক্‌লডও হন।

আমি তাও জানি না।

আপনাকে হয়তো জানানো হয়নি।

তারপর কী হল?

দিন পাঁচেক বাদে নবেন্দু ফুড পয়জনিং-এ মারা যায়।

সেটাও কি খুন বলে সন্দেহ করছেন আপনি?

মুশকিল কী জানেন, এই আকস্মিক মৃত্যুগুলি সীতানাথবাবুর পথ

পরিষ্কার করে দেয়।

এ তো অন্যায় সন্দেহ। একজন মৃত মানুষের গায়ে কাদা ছোড়া।

আমার উদ্দেশ্য কিন্তু তা নয়। আমার উদ্দেশ্য সীতানাথবাবুর খুনের কারণ জানা এবং খুনিকে ধরা।

আপনারা ট্যাক্সিওয়ালাটাকে ছেড়ে দিলেন কেন? ওকে ভাল করে ধোলাই দিলে ঠিক স্বীকার করত যে খুনটা ও-ই করেছে।

ট্যাক্সিওয়ালাই খুন করেছে বলে কি আপনার মনে হয়?

তাই তো হওয়ার কথা। পুলিশ ঠিক লোককেই ধরেছিল। ছেড়ে দিয়ে ভুল করলেন, সে তো পালিয়ে যাবে।

পালানোরই তো কথা। তবে সেটা ভুল হবে। বোধহয় লোকটা তত বোকা নয়।

কী জানি বাবা, আপনাদের কাণ্ডমান্ড আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

আচ্ছা, সীতানাথবাবুর খুন হওয়ার দিন সন্ধেবেলা আপনি কোথায় ছিলেন?

অ্যালিবাই তো! পুলিশকে বলেছি।

আর একবার বলুন।

আমার তো সারাদিনই আমার দোকানে কেটে যায়। আমার কর্মচারীরা কাজ করে, আমি ডিজাইন নিয়ে থাকি। ওখানেই খুব লাইট লাঞ্চ সেরে নিই। ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায়।

কত রাত হয়েছিল সেদিন?

সেদিন তো বৃষ্টি ছিল। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে দোকানের সামনে হাঁটুজল দাঁড়িয়ে যায়। আমিও আটকে পড়ি। গাড়িতে জল ঢুকে যাওয়ায় গাড়িও অচল হয়ে পড়ে।

গাড়ি কি আপনি নিজেই চালান?

হ্যাঁ। আমার স্বামীর মতো আমার অত ভয়টয় নেই।

আপনি একাই আটকে পড়েছিলেন? নাকি আপনার কর্মচারীরাও আটকে ছিল?

কর্মচারীদের আটটায় ছুটি হয়। কেউ কেউ আটকে ছিল, অনেকে জল ভেঙেই চলে যায়।

আপনার ক' জন কর্মচারী?

ছ' জন। পুজোর আগে কয়েকজন একস্ট্রা হ্যান্ড নিতে হয় পার্টটাইমার হিসেবে।

রাত কটা অবধি আপনাকে আটকে থাকতে হয়?

দশটা।

আপনি একা ছিলেন না আর কেউ ছিল?

সাড়ে আটটার পর কেউ ছিল না। আমি দোকানের দরজা বন্ধ করে ভিতরে বসে কাজ করছিলাম।

তারপর?

দশটার পর দেখলাম, বৃষ্টি তখনও পড়ছে। বাধ্য হয়ে পায়ে হেঁটেই বেরিয়ে পড়ি।

হেঁটেই ফেরেন?

হ্যাঁ। হিন্দুস্থান পার্ক তো এখান থেকে খুব দূরে নয়। তবে জল ভেঙে আসতে অনেক সময় লেগেছিল।

কখন বাড়িতে পৌঁছোন?

এগারোটার কাছাকাছি। পঞ্চাননতলায় প্রায় কোমর জল ছিল।

জানি। আপনার দোকানে জল ঢোকেনি?

ঢুকবে না? একতলায় ঢুকেছিল। আসলে আমার দোকানটা একটা গ্যারেজ আর মেজেনাইন ফ্লোর নিয়ে। আমি দোতলায় বসি। একতলায় শো-রুম।

তা হলে সাড়ে আটটার পর থেকে রাত এগারোটা অবধি আপনি একাই ছিলেন?

হ্যাঁ।

বাড়িতে ফিরে এসে কী করলেন?

সেদিন খুব ভিজেছিলাম, তাই ফিরে গরম জলে চান করি, তারপর সামান্য খেয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

সীতানাথবাবু ফেরেননি দেখে চিন্তা হয়নি?

না। ওঁর তো রাত হতই, তা ছাড়া ফিরতে না পারলে কোথাও হয়তো স্টে করবেন বলে ধরে নিয়েছিলাম।

ফোন করেছিলেন কি?

না।

আপনি খবরটা কখন পেলেন?

রাত একটা নাগাদ। থানা থেকে ফোন এসেছিল। রাতে আমি সাধারণত ফোন ধরি না, ফোন ধরেছিল সুধা, আমার কাজের মেয়ে।

আপনার কাজের লোক কজন?

সবসময়ের জন্য দুজন। সুধা আর নিশা। ঠিকে লোক আছে।

আপনাকে কখন খবর দেওয়া হয়?

সঙ্গে সঙ্গেই। সুধা আমাকে ডেকে ঘুম থেকে তুলে খবরটা দেয়।

আপনাদের তো একজন দরোয়ানও আছে?

হ্যাঁ। সে নীচে থাকে।

খবর পেয়েই কি আপনি থানায় যান?

না, তার উপায় ছিল না। তখনও বৃষ্টি পড়ছে, চারদিকে জল, গাড়ি নেই।

কী করলেন?

অপেক্ষা করতে হল। ভোর চারটে নাগাদ গিয়ে আমি ওঁকে শনাক্ত করি। সব ঠিক বললাম তো?

হ্যাঁ। চমৎকার বলেছেন।

॥ পাঁচ ॥

দুপুরে কালীঘাটে এক অল্পবয়সি স্বামী-স্ত্রী আর এক বুড়িকে নামিয়ে সুমিত গাড়িটা অপূর্ব মিত্র রোডে ঢুকিয়ে পার্ক করে একটা বই বের করে পড়তে শুরু করেছিল। দর্শনশাস্ত্রের একটি কঠিন ইংরিজি বই। আজও তার দর্শনশাস্ত্র ভাল লাগে। পড়তে পড়তে বুঁদ হয়ে যায়। সে ইচ্ছে করেই দর্শনশাস্ত্রে অনার্স নিয়েছিল। জানত, এ বিষয়ে পড়াশুনো করলে ভাল চাকরি পাওয়ার আশা কম। ভাল রেজাল্ট করলে বড়জোর একটা অধ্যাপনার চাকরি জুটতে পারে। ক্যারিয়ারের চিন্তা তার কোনওদিনই ছিল না। অনেকের ভিতরে উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে না। তার ভিতরেও নেই। জীবনটা কেটে গেলেই হল।

কে একজন জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

যাবেন তো!

সুমিত তাকাল না। বলল, এখন লাঞ্চটাইম।

লোকটা একটু রেগে গিয়ে বলে, সবসময়েই আপনাদের একটা না একটা এক্সকিউজ থাকেই। ব্যাপারটা কী বলুন তো।

সুমিত এবার বইটা বন্ধ করে তাকায়। বেশ ভদ্রলোকের মতোই চেহারা। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি। সঙ্গে বেশ সুন্দরী এক ভদ্রমহিলা, পরনে দামি বেনারসি। অল্পবয়সি দম্পতি।

সুমিত বইটা পাশে রেখে দিয়ে বলল, উঠুন।

লোকটা হঠাৎ অবাক হয়ে তাকে দেখছিল। গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করে বলল, গড়িয়া।

সুমিত নীরবে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে চালাতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ পর পিছন থেকে ছেলেটি বলল, আপনি একটু আগে ওটা কী বই পড়ছিলেন?

সুমিত মৃদুস্বরে বলল, ওটা একটা ফিলজফির বই। বার্টান্ড রাসেলের বই!

আপনি কি দর্শনশাস্ত্র জানেন?

সামান্যই। মাঝে মাঝে পড়ি।

আশ্চর্য!

সুমিত কিছু বলল না।

ও বই একজন ট্যাক্সিওয়ালা পড়ছে, ভাবাই যায় না।

সুমিত একটু হাসল, বলল, আমি ট্যাক্সিওয়ালাই, বাড়তি কিছু নয়।

আপনি আমাকে খুব চমকে দিয়েছেন। গল্প উপন্যাস পড়তে দেখলে হয়তো এত অবাক হতাম না। কিন্তু ওটা শক্ত বই।

আপনি কি দর্শনশাস্ত্র পড়েছেন?

আমি ইউনিভার্সিটিতে দর্শন পড়াই।

ও।

রিয়ার ভিউ মিররে সুমিত একঝলক ওদের দেখে নিল। দুজনেই বেশ সুন্দর দেখতে। মেয়েটি বিশেষ করে। দুজনেই তাকে কৌতূহল নিয়ে দেখছে।

কত দূর পড়েছেন আপনি?

এম এ।

পাশ করেছেন?

টেনেমেনে।

ভাবা যায় না। ট্যাক্সি চালান কেন?

তা হলে কী করব বলুন। দর্শন দিয়ে তো পেট ভরে না।

ইউ আর রাইট। এসব বিষয় হয়তো একদিন উঠেই যাবে। ভাল ছাত্র তো পাওয়াই যায় না।

ঠিকই বলেছেন। ক্যারিয়ারের কথা ভাবলে তো পড়তাম না।

এখনও দর্শন পড়তে ভাল লাগে?

লাগে।

গড়িয়ায় লোকটাকে নামানোর সময় ভাড়া দিতে গিয়ে লোকটা বলল, আমার বাড়িতে বসে এক কাপ চা খেয়ে যাবেন?

সুমিত হেসে বলে, না। এবার গিয়ে ভাত খাব। এখন চা নয়। অনেক ধন্যবাদ।

আমার বাড়িটা চিনে রাখুন। যখন খুশি চলে আসবেন। আমার নাম প্রসূন ঘোষ।

নমস্কার।

আপনার নাম?

সুমিত ঘোষাল।

কলকাতায় আজকাল বাঙালি ট্যাক্সিওয়ালা তো দেখাই যায় না। তার ওপর দর্শনের এম এ।

সুমিত বুঝল, বইটা শো করা তার উচিত হয়নি। যখন মলাট বন্ধ করে রাখছিল তখনই দেখে ফেলেছে, এখন থেকে সাবধান হতে হবে।

মেয়েটা হঠাৎ তার স্বামীকে বলল, তোমার তো কত বই রয়েছে। ওঁকে

দুটো বই দাও না। উনি যখন পড়তে ভালবাসেন।

প্রসূন একটু হেসে বলল, আরে তাই তো! দাঁড়ান ভাই, আপনাকে কিছু বই দিচ্ছি। ফেরত না দিলেও চলবে।

ওরা ভিতরে চলে গেল। বেশ খানিকটা বাদে মেয়েটা এসে গোটাতিনেক বই জানালা দিয়ে বাড়িয়ে ধরে চাপা গলায় বলল, চিঠিটা পড়বেন বুলুদা। প্লিজ।

বলেই পাখির মতো উড়ে ভিতরে চলে গেল।

ভীষণ অবাক হল সুমিত। বুলুদা! চেনা মেয়ে ছাড়া কে ডাকবে তাকে এ নামে? কিন্তু তার তো চেনা চেনা মনে হয়নি একবারও!

গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে গড়িয়াহাটের দিকে চালিয়ে দিল সে। মিটার ডাউন করে নিয়েছে। আর সওয়ারি তুলবে না এখন।

বাড়িতে ফিরে বইগুলো একটু দেখল সে। তিনটেই হাল আমলের লেখা দর্শনের বই। প্রথম বইটার শক্ত মলাট ওলটাতেই একটা ভাঁজ করা কাগজ পেল সে। তাতে তাড়াহুড়ো করে লেখা, বুলুদা, আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন জানি। ধন্যবাদ যে সেটা আমার স্বামীর সামনে প্রকাশ করেননি। অলককে কিন্তু আমার ঠিকানা দেবেন না, ও আমাকে খুন করে ফেলবে। প্লিজ! মনে রাখবেন। রানি।

কে অলক! কে রানি! হাঁ করে একটু ভাবল সুমিত। তারপর ঝপ করে মনে পড়ে গেল।

অলক! গরিবের ঘরে জন্মেছিল বটে, কিন্তু কিছু খামতি ছিল না ছেলেটার। লেখাপড়ায় ভাল, গানে ভাল, স্পোর্টসে ভাল, সবচেয়ে ভাল ফুটবলে। মাত্র ষোলো বছর বয়সে ফার্স্ট ডিভিশনে খেলত। খেলে অনেকেই, কিন্তু অলক ছিল সত্যিকারের বল প্লেয়ার। যে টিমটায় খেলত সেটাকে প্রথম বছরেই লিগ টেবিলের তলা থেকে প্রথম তিনে তুলে এনেছিল অলকের পা। দৌড় ছিল দেখার মতো। কিন্তু বাঙালি ছেলে ফর্ম ধরে রাখতে পারে না, সাফল্য আর খ্যাতি মাথায় চড়ে যায় বলে। মাত্র আঠারো-উনিশ বছর বয়সেই তাকে ঘিরে মেয়েদের ভিড়। তারপর বড় টিমে ট্রান্সফার নিল, একটা চাকরিও হল ব্যাঙ্কে। তারপর যথারীতি একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল। বেশি দিনের কথা নয়, বড় জোর দু-আড়াই বছর। বুলুকে এসে ধরল, মেয়েটার মা-বাবা বিয়ে দিতে চাইছেন না বুলুদা, তুমি ব্যবস্থা করে দাও। আমরা পালিয়ে বিয়ে করব।

পাড়ারই মেয়ে। অলকের বস্তির ঘর থেকে মেয়েটার বাড়ি দেখা যায়। দূরত্ব এমনিতে কিছু নয়, কিন্তু সামাজিক দূরত্ব অনেক। মেয়েটার বাবার

ওষুধের ব্যবসা এবং প্রচুর টাকা।

সুমিত তখন এসব কাজে কিছু অগ্রণী ছিল। কোচিং ক্লাস থেকে ফেরার পথে এক সকালে ট্যাক্সিতে তুলে নিল মেয়েটাকে। তারপর রেজিস্ট্রি করে বিয়ে এবং অলকের ঢাকুরিয়ায় সদ্য-ভাড়া-করা ফ্ল্যাটে সংসার স্থাপন।

এ পর্যন্ত জানে সুমিত। অলক আর রানির গল্পে এরপর থেকে সে আর ছিল না। ভুলেই গিয়েছিল ওদের কথা। এমন হতেই পারে যে, ওদের বনিবনা হয়নি এবং ছাড়াছাড়িও হয়ে গেছে। আকছারই তো হয়। কিন্তু তা বলে অলক খুন করবে বলে রানি ভয় পাচ্ছে কেন?

সুমিত একটু ভাবতে ভাবতে তার ইকমিক কুকারে রান্না বসিয়ে কলঘরে গিয়ে চান করল। সারভেন্টস কোয়ার্টার হলেও ব্যবস্থা বেশ ভাল। প্রেস্টিজের বালাই না থাকলে অজয় সেনের ফ্ল্যাটের চাকরদের ঘরে তোফা থাকা যায়। অবশ্য এটা কোনও পাকা ব্যবস্থা নয়। অজয় সেন যদি ফেরে তা হলে তার বাড়ির কাজের লোকের জন্য ঘর ছেড়ে দিতে হবে। তবে সুমিতের সুবিধে এই যে, সে ভবিষ্যতের চিন্তা করে না। কালকের চিন্তা কাল, আজকের দিনটা তো কাটিয়ে দিই।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর রানির চিঠিটা আবার পড়ল সে। ঘটনাটা অনুমান করার চেষ্টা করল। সম্ভবত রানি অলকের কাছ থেকে পালায় এবং প্রসূন ঘোষকে বিয়ে করে। কিন্তু অলক সেটা মেনে নিতে পারেনি বা পারছে না। কিন্তু খুন করার মতো কী ব্যাপার? অলকের সঙ্গে তার অনেক দিন যোগাযোগও নেই।

দরজাটা খোলা রেখেই খাটিয়ায় শুয়ে বইগুলোর মধ্যে একটা বেছে নিয়ে পড়তে লাগল সে। পড়তে পড়তে বুঁদ হয়ে গেল। এখনও দর্শনশাস্ত্র তার কাছে এক আশ্চর্য মুক্তি। দর্শনই তাকে প্রতিদিনকার আত্মগ্লানি থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

বিকেলে ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে সওয়ারি এধার ওধার করল কিছুক্ষণ। হাওড়া, গড়িয়াহাট, বেহালা, টালিগঞ্জ, ইস্টার্ন বাইপাস হয়ে যোধপুর পার্কের সওয়ারি পেয়ে গেল একটা।

রাত নটায় গোবিন্দপুরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নেমে পড়ল সুমিত।

অলকের খাতির ছিল পরেশনাথের সঙ্গে। ফুটবল-পাগল পরেশনাথ একসময় ময়দানের আনাচেকানাচে খুব ঘুরে বেড়াত। বলতে কী, অলককে হাত ধরে সে-ই একটা বড় ক্লাবে চান্স করে দেয়।

দরজা খোলাই ছিল। বাইরে থেকেই সুমিত ডাকল, পরেশদা!

দুটো ছেলেমেয়ে পড়ছিল চৌকিতে বসে। দুজনে একসঙ্গে বলে উঠল,

বাবা বাড়ি নেই।

বউদি আছে?

না, মা-ও ফেরেনি।

ঠিক এইসময় পাশের খুপরি থেকে উঠে এল দীয়া। মুখে ঘাম, হাতে মশলার দাগ।

ওঃ, বুলুদা!

হ্যাঁ। পরেশদার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।

ঘরে এসে বসুন না, বাবা এখনই আসবে।

থাক, ঘরে গরম লাগবে।

খুব সুন্দর হাসি মেয়েটার, লজ্জাসরমের ভাবটাও খুব আছে। বলল, পাখার সামনে বসবেন।

সুমিত ঘরে ঢুকল, চেয়ারে বসল। পাখাটা তার দিকে ঘুরিয়ে দিল দীয়া।

তুমি এখন কী পড়ছ দীয়া?

সামনের বছর মাধ্যমিক দেব।

বাঃ, বড় হয়ে গেলে?

লজ্জায় যেন মরে গেল দীয়া। ওর এই লজ্জার ভাবটুকু ভীষণ ভাল লাগছিল সুমিতের। বস্তির এই বয়সের মেয়েদের হায়া লজ্জা কিছু থাকে না। অল্প বয়সেই প্রেম হয়ে যায়, বিয়ে হয়ে যায়, ছাড়াছাড়িও হয়ে যায়। তারপর আবার বিয়ে করে এবং এইভাবেই চলতে থাকে। কিছু বিয়ে টিকেও যায়। কিন্তু লজ্জাসরমটা বয়ঃসন্ধিতেই কেটে যায় ওদের।

আপনি বসুন, আসছি, বলে দীয়া খুপরিতে গিয়ে ঢুকল এবং ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে পরিষ্কার কাপে চা নিয়ে এল।

চায়ে চুমুক দিয়ে সুমিত টের পেল, চা পাতা যেমন হোক খুব যত্ন করে করেছে।

লেখাপড়া ছাড়া আর কী কর তুমি?

মাথা নিচু করে দীয়া বলে, কী করব! গান শেখার খুব ইচ্ছে ছিল।

শেখ না কেন?

সময় পাই না যে। মা বাবা সারাদিন থাকে না, সংসার আমাকেই সামলাতে হয়।

হারমোনিয়াম নেই তোমার?

আছে। অনেক পুরনো। আগে ভোরবেলা গলা সাধতাম। এখন তাও বন্ধ।

পরেশদা একসময় গান গাইতেন, জান তো!

হ্যাঁ। বাবাও এখন আর গান গায় না।

এ পাড়ায় থাক, পরিবেশ খারাপ, বেশি মেলামেশা কর না তো!

না মিশে তো উপায় নেই, তা হলে শত্রুতা করবে। তবে মাখামাখি করি না।

খুব ভাল। আর একটা কথা। কারও বাড়িতে কাজটাজ করার ইচ্ছে যেন না হয়। আমার বউদি খুব ধরেছিল আমাকে। আমি বলে দিয়েছি, তুমি করবে না।

দীয়া চোখ তুলছে না। পায়ের বুড়ো আঙুলে মেঝে খুঁড়তে খুঁড়তে খুব নরম গলায় বলল, ক'দিন আর না করে পারব বলুন। মা এখন কাজ করতে দিতে চায় না ঠিকই, কিন্তু যখন নিজে আর পারবে না, তখন—

কথাটা শেষ করল না দীয়া। চুপ করে গেল।

পাড়ার ছেলেরা পিছনে লাগে না তো!

দীয়া এই প্রশ্নে কুঁকড়ে গেল যেন। সিঁটিয়ে গিয়ে বলল, ও কিছু নয়। একটু-আধটু কখনওসখনও—

কোনওরকম অসুবিধে হলে আমাকে বোলো।

দীয়া ঘাড় কাত করে বলে, আচ্ছা। আপনাকে দুখানা রুটি দিই?

না না। চা-ই ভাল।

ছেলেমেয়েদুটো পড়া ফেলে হাঁ করে চেয়ে ছিল। বিশু বলল, দিদির রুটি খুব ভাল হয়। নরম। মার রুটি শক্ত হয়।

সুমিত হেসে বলল, তাই নাকি?

বুড়ু সঙ্গে সঙ্গে মায়ের পক্ষ নিয়ে বলে, না না, মায়ের রুটিও খুব ভাল হয়।

দীয়া মুখে আঁচল দিয়ে হাসি চাপল। মুগ্ধ হয়ে এক পলক তাকিয়ে রইল সুমিত। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিল।

আজ রাত হয়ে গেছে। পরেশদার হয়তো দেরি হবে। আমি চলি।

দীয়া যেন একটু আকূল হয়ে বলে উঠল, একটু বসুন না। বাবা ঠিক চলে আসবে।

সুমিতের কেন যেন বসে থাকতেই ইচ্ছে করছে। আবার বসে থাকছে বলে একটু লজ্জাও হচ্ছে। সে কি মেয়েটার প্রেমে পড়ে গেল নাকি? লক্ষণটা তো ভাল নয়। মেয়েটাকে তার ভীষণ ভাল লাগছে যে!

সুমিত উঠে দাঁড়িয়ে দুর্বলতাটা কাটাল। দৃঢ় গলায় বলল, না, আজ আসি। পরেশদার সঙ্গে দরকারটা তেমন জরুরি নয়। একটা খবরের জন্য এসেছিলাম। তা সেটা পরে জানলেও হবে।

দীয়া হঠাৎ চোখ তুলে বলল, আমাদের কিন্তু রুটি কম পড়বে না।

সুমিত হেসে ফেলল। বলল, তা জানি। কিন্তু আজ নয়, আর একদিন হবেখন।

আপনি তো গিয়ে রেঁধেই খাবেন।

কী করে জানলে?

বাবার কাছে শুনেছি। সারাদিন গাড়ি চালিয়ে কারও কি রাঁধার ইচ্ছে থাকে।

মাথা নেড়ে সুমিত বলে, না, সবসময় রাঁধি না। বাইরে হোটেলে খেয়ে নিই।

মেয়েটা করুণ গলায় বলে, বাবা এলে কী বলব?

কিছু বলতে হবে না। আমি পরে আসবখন।

মেয়েটার সুন্দর দুখানা চোখে কি জলের আভাস দেখল নাকি সুমিত? মেরেছে। এই মেয়েটার তো দেখা যাচ্ছে, তার ওপর প্রগাঢ় দুর্বলতা? তাই অত লজ্জা! অত নতমুখে কথা!

কিন্তু বয়স! সুমিতের প্রায় ত্রিশ বছর বয়স! মেয়েটার কত হবে...? বয়সের চিন্তাটাই বা কেন করছে সে? ইস, ছিঃ ছিঃ, এ যে নিজের কাছে বড্ড ধরা পড়ে যাচ্ছে সে!

সুমিত তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে আসছিল।

মেয়েটা দরজার কাছে এসে প্রায় ধরা গলায় বলে, কবে আসবেন?

আসব। এর মধ্যেই চলে আসব একদিন।

আসবেন কিন্তু...

সুমিতের কান গরম হয়ে যাচ্ছে। বুকের মধ্যেও ধড়ধড়ানি। এ তো খুব মুশকিলে পড়া গেল! না, সে আর এ মুখো হবে না কখনও। এরকম আর হয়নি কখনও তার। যখন সোনালি তাকে প্রেম নিবেদন করেছিল তখনও নয়।

বস্তির গলির মুখটায় পরেশদার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। উনি ফিরছেন!

আরে বুলু! কখন এলে!

একটু আগে। আপনার কাছেই এসেছিলাম।

তা হলে চলো, ঘরে গিয়ে বসবে।

সুমিত আর দীয়ার সামনে যেতে চায় না। গেলে ধরা পড়ে যাবে হয়তো। সে সভয়ে বলল, না না, আজ আর নয়।

কিছু দরকার ছিল?

হ্যাঁ দাদা। অলকের কোনও খবর জানেন?

খুব জানি। খবর তো ভাল নয়। মেয়েছেলে, মদ এসব নিয়ে বড্ড মেতে পড়ল। বউটার ওপর অত্যাচার করত। শেষে বিয়ের দু-তিন মাসের মাথায় রানি পালিয়ে যায়। তাতে কী রাগ! গুন্ডা ষণ্ডা নিয়ে তার বাপের বাড়িতে চড়াও হয়েছিল। খুন করার হুমকি দিত।

তারপর?

রানির বাবা রানিকে কোথাও পাচার করে দিয়েছিল।

তারপর কিছু জানেন?

জানি। খবর ভাল নয়। হেরোইনের নেশা ধরেছে।

আপনার সঙ্গে দেখা হয়?

আজকাল আর ইচ্ছে করেই দেখা করি না। বড্ড কষ্ট হয় দেখলে। কত সম্ভাবনা ছিল ছেলেটার। এখন নির্জীব হয়ে গেছে।

॥ ছয় ॥

লাট্টুরামকে আপনি চেনেন?

চিনি।

কীরকম চেনেন?

যখন গোবিন্দপুর বস্তিতে থাকতাম তখন চিনতাম। কল সারাত।

কীরকম লোক?

কারও সাতে পাঁচে থাকে না, কথা খুব কম বলে।

বস্তিতেই থাকত তখন?

হ্যাঁ। এখন বাড়ি করেছে। দোতলা বাড়ি।

হ্যাঁ। সেসব খবর আমাদের জানা আছে। একটা কথা বলুন।

কী?

সীতানাথবাবুর বাড়ি যোধপুর পার্কে। কিন্তু সেদিন ওঁর সঙ্গী ভদ্রলোক ওঁকে গড়িয়াহাটে নামিয়ে দিতে বলেছিলেন। ঠিক তো?

হ্যাঁ।

গড়িয়াহাটের কোথায় নামাতে হবে তা বলেননি?

না।

খুব ভাল করে ভেবে বলুন।

আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে। গড়িয়াহাট।

সীতানাথবাবুর স্ত্রীকে দেখলেন?

হ্যাঁ। আপনি বলার পর গতকালই সকালে আমি ওঁর বুটিকের দোকানের সামনে ট্যাক্সি পার্ক করে বসে ছিলাম। উনি একটা ইন্ডিকা গাড়ি করে এলেন। গাড়ি থেকে নেমে দোকানে ঢুকে গেলেন।

ট্যাক্সির সেই মহিলার সঙ্গে কোনও মিল পেলেন কি?

বলা কঠিন। খুব কঠিন। সেই ভদ্রমহিলাকে আমার যুবতী বলে মনে হয়েছিল। ইনি বয়স্কা।

কিন্তু ফিগার, হাঁটার ভঙ্গি, হাইট এসবের মিল আছে কি?

ওই তো বললাম, বলা কঠিন। তবে দুজনেই ছিপছিপে।

সেই ভদ্রমহিলা যে যুবতী ছিলেন সেটাও তো আপনার আন্দাজ।

হ্যাঁ। তাঁকে ভাল করে দেখিনি। ভুল হতেই পারে।

সীতানাথবাবুর স্ত্রী তাঁর স্বামীর খুনিকে ধরার জন্য একটু উদ্‌গ্রীব হয়েছেন। তাঁর ধারণা আপনাকে ছেড়ে দিয়ে আমি ভাল কাজ করিনি।

উনি হয়তো আমাকে সন্দেহ করছেন। পুলিশও করছে।

আপনি যে সন্দেহের উর্ধ্বে নন।

হ্যাঁ। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যথেষ্ট জোরালো বক্তব্য আমার নেই।

আপনাকে ছেড়ে দিয়েছি বলেই আপনি সেটা অ্যাকুইটাল ভেবে নেবেন না। আমরা আপনার ওপর নজর রাখছি।

সুমিত একটু হাসল। বলল, ট্যাক্সি চালাই, বই পড়ি, এ ছাড়া আমার আর কোনও কাজ নেই। নজর রেখে কী আর হবে।

লাট্টুরাম যে একজন খুনি এটা আপনি জানতেন না?

আজ্ঞে না। তাকে কখনও খুনি বলে মনে হয়নি। আপনার কাছেই প্রথম শুনলাম।

লাট্টুরামকে খুনি বললে তার অপমানই হয়। বলা উচিত হত্যাশিল্পী। আজ অবধি পুলিশ তার টিকিও ছুঁতে পারেনি।

তাও শুনলাম।

আপনি যখন গোবিন্দপুরে থাকতেন তখন তার আচরণে কিছুই বুঝতে পারতেন না?

না। কখনও কিছু সন্দেহ হয়নি।

মুশকিল, খুবই মুশকিল। ঠিক আছে। আজ এই পর্যন্তই। ভাল কথা, সোনালির সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?

না তো!

মেয়েটি আপনার রিলিজের জন্য অনেক চেষ্টা করেছে। গ্র্যাটিচুড হিসেবেও কি ওকে আপনার একটা ধন্যবাদ জানানো উচিত নয়?

হয়তো উচিত। কিন্তু আমি' ওদের বাড়ি যাই না। সোনালিও নানা এনগেজমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

একটা ফোনও তো করা যায়।

আমার ইচ্ছে হয়নি।

এত বিরাগের কারণ কী? মেয়েটা তো আপনাকে ভালবাসত। হয়তো এখনও বাসে।

না, ওটা বোধহয় ভুল ধারণা। সোনালি সিমপ্যাথেটিক, কিন্তু নট ইন লাভ।

কথাটা আগেও বলেছেন। আপনার অন্য কারও সঙ্গে প্রেম নেই তো!

খুব দৃঢ় স্বরে সুমিত বলল, না।

বড্ড জোর দিয়ে বললেন। কাল সকাল দশটা নাগাদ আপনি আমার কাছে রিপোর্ট করবেন। গায়ে ট্যাক্সিওয়ালার পোশাকটা যেন থাকে। আমি আপনাকে একটা বাড়িতে নিয়ে যাব। আপনার কাজ হবে খুব মাইনিউটলি

সব কিছু লক্ষ করা।

কী লক্ষ করব?

একজন ভদ্রমহিলাকে। তার হাবভাব এবং সবকিছু।

ঠিক আছে।

নমস্কার। আমিই আপনাকে ফোন করেছিলাম। আমার নাম শবর দাশগুপ্ত। গোয়েন্দা। আপনিই রুমকি তো!

মহিলা একটু নার্ভাস। চোখে বিব্রত দৃষ্টি। বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসুন না, বসুন।

আপনার হাজব্যান্ড বাড়িতে নেই তো!

না। উনি সকাল নটায় বেরিয়ে যান।

আপনার সুবিধের জন্যই আমি আপনার হাজব্যান্ডের অ্যাবসেন্সে আপনার বাড়িতে এসেছি।

ভদ্রমহিলা একটু অবাক হয়ে বলেন, সে কী? আমার হাজব্যান্ড থাকলে কীসের অসুবিধে?

যেসব প্রশ্ন করতে এসেছি সেগুলো আপনার হাজব্যান্ডের সামনে করলে হয়তো আপনি বিব্রত হতেন।

কী এমন প্রশ্ন আপনাদের?

আপনি কখনও সীতানাথ সমাদ্দার নামে কাউকে চিনতেন কি?

রুমকির ফরসা মুখে টক করে একটা লাল আভা ফুটে উঠল। অবাক ভাবটা ধরে রেখেই বলল, হ্যাঁ। উনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। কিছুদিন আগে উনি খুন হয়েছেন বলে কাগজে দেখেছি।

হ্যাঁ।

কিন্তু আপনারা আমার কাছে কেন এসেছেন? ওঁর সঙ্গে বহুকাল আমাদের সম্পর্ক নেই। যদি ওঁর মার্ডারের ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন করেন তা হলে আমার কিছু জানা নেই।

অত তাড়াহুড়ো করবেন না। শান্ত হোন।

বলুন।

আপনি বললেন উনি আপনার বাবার বন্ধু ছিলেন। সেই বন্ধুত্বটা কি ইদানীংও ছিল?

না। বাবার সঙ্গে ওঁর একটা ঝগড়া হয়ে যায়। তারপর থেকে আর সম্পর্ক নেই।

আপনার বাবা তো বেঁচে নেই, তাই না?

না। মা বাবা কেউ বেঁচে নেই।

ঝগড়াটা কী নিয়ে হয়েছিল তা জানেন?

না।

একেবারে কিছুই জানেন না?

না।

কানেও আসেনি দু-একটা কথা?

আমার সামনে এ নিয়ে আলোচনা হয়নি।

সীতানাথবাবুকে আপনি কী বলে ডাকতেন?

কাকু।

একসময় আপনাদের দুই পরিবারে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাই না?

হ্যাঁ।

কীরকম ঘনিষ্ঠতা?

যাতায়াত ছিল। যেমনটা হয়।

সীতানাথবাবু কেমন লোক ছিলেন?

ভালই তো মনে হত।

কীরকম ভাল?

অত ভেবে দেখিনি। হাসিখুশি মানুষ ছিলেন।

উনি খুব হ্যান্ডসাম ছিলেন, তাই না?

চুপচাপ সোফার কোণে বসে সুন্দরী রুমকিকে লক্ষ করছিল সুমিত। এই প্রশ্নে ফের একবার রুমকির মুখে রক্তের ঝাপটা লাগল।

হ্যাঁ।

অ্যাট্রাকটিভ?

এসব প্রশ্ন করছেন কেন?

আপনার ভালর জন্যই।

সীতানাথকাকু দেখতে ভাল ছিলেন কি না তা দিয়ে কী হবে? আর তাতে আমার ভালটাই বা কীসের, কিছু বুঝতে পারছি না।

আপনি বিরক্ত হচ্ছেন। কিন্তু প্রশ্নগুলো তো নিতান্তই নিরীহ। বিরক্ত হওয়ার মতো তো নয়।

রুমকি একটু হাসল এবার। হাসিটা স্বস্তির নয়, স্বতঃস্ফূর্তও নয়। বলল, আসলে এসব অনেক দিন আগেকার কথা। বিশ-বাইশ বছর হবে বোধহয়। আমার অত কিছু মনেও নেই।

শবর স্থির ও তীক্ষ্ণ ঈগলের দৃষ্টিতে রুমকির মুখের দিকে চেয়ে ছিল। সেই দৃষ্টির সামনে অস্বস্তি হওয়াটা স্বাভাবিক।

মনে না পড়াটা কাজের কথা নয় মিসেস সেনগুপ্ত। কারণ আমাদের তদন্তের জন্য আপনার সাক্ষ্য বিশেষ জরুরি। কষ্ট করে এবার একটু মনে করার চেষ্টা করুন।

আমার এসব প্রশ্নের জবাব দিতে ভাল লাগছে না।

সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে বিরক্ত করব না। পুলিশ আপনাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে এবং পুলিশ কাস্টডিতে আপনাকে গ্রিল করা হবে। উড ইউ প্রেফার দ্যাট?

ওমা! কেন? আমি কী করেছি?

আমরা সেইটেই বুঝবার চেষ্টা করছি। এ পর্যন্ত আপনাকে কোনও আনপ্লেজান্ট প্রশ্ন করা হয়নি। প্লিজ কোঅপারেট।

ঠিক আছে। বলুন।

আর প্রশ্ন করার আগে আপনাকে জানিয়ে রাখি, দয়া করে মিথ্যে কথা বলবেন না। আমরা আপনার সম্পর্কে হোমওয়ার্ক না করে এখানে আসিনি।

রুমকির চোখে স্পষ্টই আতঙ্ক ফুটে উঠল, হোমওয়ার্ক! কীরকম হোমওয়ার্ক? আপনারা আমাকে হ্যারাস করছেন কেন?

যদি ঠিকঠাক জবাব দেন তা হলে হ্যারাসমেন্ট কিছুই হবে না। সময়ও বেঁচে যাবে।

ঠিক আছে, প্রশ্ন করুন।

সীতানাথবাবুর বয়স যখন পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ সেইসময় তিনি ছিলেন একজন রূপবান, আকর্ষণীয় পুরুষ। মধ্য চল্লিশকে এ দেশে প্রৌঢ়ত্বের বয়স বললেও আসলে ওটা পরিণত যৌবন। কী বলেন?

কী মিন করছেন?

আপনার বয়স তখন পনেরো-ষোলো-বা সতেরো, তাই না?

উনি আমার বাবার বন্ধু।

তাকে কী? তাতে ওঁর পক্ষে আপনার বন্ধু হওয়া আটকায় না।

রুমকি এবার স্পষ্টই রেগে গিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, এসব কী বলছেন আপনি?

শবর ভাবলেশহীন মুখে চেয়ে থেকে বলল, আপনার বাপের বাড়ির পাড়ায় আপনার পুরনো প্রতিবেশীরাও অনেক কথা বলে।

ওরা মিথ্যে কথা বলে।

কেন বলে?

আমি জানি না।

আপনাকে আমি এখনও এমন কোনও প্রশ্ন করিনি যাতে আপনি এতটা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তা হলে কি ধরে নেব এই জেরা আরও একটু গভীরে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করেই আপনি রেগে যাচ্ছেন?

রুমকি নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে তেতো গলায় বলল, আপনার প্রশ্নের ধরন আমার ভাল লাগছে না।

আপনার মনের মতো প্রশ্ন করার জন্য তো আমি আসিনি ম্যাডাম। আমি এসেছি একটি গুরুতর তদন্তে।

আমি যদি উকিল ডাকি?

স্বচ্ছন্দে। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমার আগমনটা আর আনঅফিসিয়াল থাকবে না।

আপনি কি আনঅফিসিয়ালি এসেছেন?

আপাতত তাই। প্রয়োজন না হলে ব্যাপারটাকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে আমার নেই।

আচ্ছা, যা জানতে চান বলুন।

এই নিয়ে তিনবার আপনি ওকথা বললেন, কিন্তু প্রশ্ন করতেই রেগে গেলেন।

আমার আপনাকে ভাল লাগছে না।

সেজন্য দুঃখিত। আমি অ্যাট্রাকটিভ নই আমি জানি।

ওভাবে কথাটা বলিনি। আপনার কথাবার্তার ধরন যেন কেমন।

তার কারণ আমি একটা ঢাকনা খুলতে এসেছি। সেটা খুব প্লেজান্ট ব্যাপার নয়। ঢাকনার নীচে নোংরাই থাকে সাধারণত। আমি কি আর প্রসিড করব?

হ্যাঁ। শুধু অনুরোধ আমার হাজব্যান্ডকে এসবের মধ্যে টানবেন না। আমরা সুখী পরিবার।

শুনে খুশি হলাম। অভিনন্দন।

কথা দিলেন তো!

পুলিশ কথাটথা দিতে পারে না। প্রয়োজন হলে পুলিশকে অনেক অপ্রিয় কাজ করতে হয়।

রুমকি হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল। তারপর কান্নায় ফ্যাসফ্যাসে গলায় অস্ফুট স্বরে বলল, আমি জানি আমার সুখটুখ সইবে না।

আগেই ভেঙে পড়ছেন কেন? বলেছি তো প্রয়োজন না হলে আপনার হাজব্যান্ডকে আমি কিছুই জানাব না। কিন্তু উনি কি কিছুই জানেন না?

এসব কথা তো চাপা থাকে না। কেউ না কেউ কথা পৌঁছে দেয়ই।

উনি কিছুই বিশ্বাস করেননি। আমাকে ভীষণ ভালবাসেন। বিশ্বাস করেন।

তার মানে আপনি ওঁকে মিথ্যে কথা বলেছেন!

সম্পর্ক বাঁচাতে অনেক কিছু করতে হয় মানুষকে।

আমার কাছে তা হলে সত্যটা বলুন। আপনি কি সীতানাথবাবুর প্রেমে পড়েছিলেন?

তখন আমার অল্প বয়স। ভালমন্দ বিচার করতে পারতাম না। আর উনিও আমাকে এত চাইতেন।

সম্পর্কটা কতদূর গড়িয়েছিল?

বেশি নয়। খুবই সামান্য।

আপনি ওঁর সঙ্গে দীঘায় গিয়েছিলেন?

মাগো! বলে ফের মুখ ঢাকল রুমকি।

আপনি অযথা সময় নষ্ট করছেন। বলুন।

হ্যাঁ।

সেখানে আপনাদের শারীরিক সম্পর্ক হয়?

সেটাও কি জানা দরকার?

হ্যাঁ। ওটা ইম্পর্ট্যান্ট।

হ্যাঁ। আমি ভুল করেছিলাম।

ভুল আপনি পরেও করেছেন।

কী ভুল?

বিয়ের পরেও আপনি সীতানাথবাবুর সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন।

কে বলল? না, কক্ষনও নয়।

আপনার স্বামী মলয় সেনগুপ্ত তখন ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সে স্টুয়ার্ডের চাকরি করতেন। তাঁকে প্রায়ই বাইরে যেতে হত।

তাতে কিছু প্রমাণ হয় না।

কিন্তু প্রমাণ যে আমাদের কাছে আছে।

কী প্রমাণ?

আপনাকে যদি আদালতে যেতে হয় প্রমাণটা তখন দেওয়া যাবে।

ইজ ইট এ ট্র্যাপ?

ট্র্যাপ যদি হয়েই থাকে তা হলে সেটা আপনারই পাতা।

রুমকি কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল।

আমাদের সময় মূল্যবান ম্যাডাম।

সব তো বলেই দিলাম।

না, এখনও কিছু বাকি আছে।

কী?

সীতানাথবাবু আপনার কাছে নিয়মিত আসতেন, তাই না?

হ্যাঁ।

মলয়বাবুকে উনি ম্যানেজ করে নিয়েছিলেন। ঠিক তো?

হ্যাঁ। মলয় আমাদের সন্দেহ করত না।

আপনি ডাবল লাইফ লিড করতেন, তাই না?

হ্যাঁ। কিছুদিন।

কত দিন?

বেশি নয়। দু-এক বছর।

আর একটু বেশি।

হতে পারে।

এরপর আপনার সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক তেতো হয়ে যায়। কেন?

উনি বাড়াবাড়িই করতেন। বিয়ে করার কথা বলতেন।

আর কোনও কারণ নেই?

আর কী কারণ?

তখন মলয়বাবুর মাইনে বেশি ছিল না। কিন্তু আপনার টাকার প্রয়োজন ছিল প্রচণ্ড। আপনি বরাবরই আরামবিলাসে থাকা পছন্দ করতেন। সীতানাথবাবু আপনাকে টাকা জোগাতেন। সেই টাকায় টান পড়ছিল।

দুর্বল গলায় রুমকি বলল, মিথ্যে কথা।

আপনার টাকার জোগান দিতে গিয়ে সীতানাথবাবু অনেক ধার-কর্জ করে ফেলেন। তারপর উনি ব্যবসা করতে নামেন। আশ্চর্যের বিষয় ওঁর মধ্যে ব্যবসার একটা সুপ্ত প্রতিভা ছিল। সেটা উনি নিজেই জানতেন না। ব্যবসাতে নেমেই উনি প্রস্পার করতে থাকেন।

আমি আর কিছু জানি না।

কেন জানবেন না? সাতান্ন-আটান্ন বছর বয়সে উনি যখন বেশ শাঁসালো লোক হয়ে উঠেছেন তখন আপনার সঙ্গে ওঁর ফের সম্পর্ক হয়।

না, ভুল খবর।

তবে এবার সম্পর্কটা মধুর ছিল না। উনি আপনাকে ব্ল্যাকমেল করা শুরু করেন। সেটা করতেন টাকাপয়সার জন্য নয়, আপনাকে শারীরিক ভাবে পাওয়ার জন্য। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ব্যাপারটা চলেছিল।

রুমকি কেমন যেন পাথরের মতো বসে রইল।

ঠিক বলছি?

মলয় যদি জানতে পারে তা হলে কী হবে জানেন?

মলয়বাবু এত দিনেও কেন জানলেন না সেইটেই বিস্ময়ের কথা। উনি কি কালা বোবা জড়বুদ্ধির মানুষ?

তা কেন? ওর কাজকর্ম থাকে।

কাজকর্ম থাকে বলে এসব টের পাবেন না, তাও কি হয়?

আপনি কী বলতে চাইছেন?

আমি মলয়বাবুর সঙ্গে অলরেডি কথা বলেছি।

চমকে উঠে রুমকি বলে, সর্বনাশ!

আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মলয়বাবু সবই জানেন। জেনেও না জানার ভান করে থাকেন।

হতেই পারে না। আপনি বানিয়ে বলছেন।

ফের উত্তেজিত হচ্ছেন ম্যাডাম। শান্ত হোন।

আপনি আমাকে উত্তেজিত করে দিচ্ছেন যে!

তার কারণ, আপনি সুন্দরী হলেও বুদ্ধিমতী নন। আপনি দুটি পুরুষকে নিয়ে জীবনটা খুব মসৃণভাবে কাটিয়ে দিলেন বলে ভাববেন না। ব্যাপারটা অত সহজে হত না যদি না পদ্মবেন নামে একটি এয়ারহোস্টেস এর মধ্যে একটি গুরুতর ভূমিকা পালন করত।

সে কে?

বললাম তো এয়ারহোস্টেস।

সে কী ভূমিকা পালন করেছে?

মলয় সেনগুপ্ত বুদ্ধিমান মানুষ। সে আমাকে চেনেও। ইন ফ্যাক্ট তার সঙ্গে আমার একটু দূর সম্পর্কের আত্মীয়তাও আছে। আমি তার সঙ্গে দেখা করে সীতানাথবাবুর প্রসঙ্গ তুলতেই সে সারেন্ডার করে ফেলল।

কী বলল মলয়?

সে প্রথম থেকেই জানত আপনি তার প্রতি বিশ্বস্ত নন। সীতানাথবাবু যে টাকাপয়সা জোগান দিত তাও তার জানা ছিল। কিন্তু সে খুব একটা মর্মাহত হয়নি। কারণ তার সবচেয়ে প্রিয় নারী ছিল অন্য একজন। ওই পদ্মবেন।

তবে আমাকে বিয়ে করেছিল কেন? আপনি গল্প বানাচ্ছেন।

মলয়কে জিজ্ঞেস করবেন, মলয় আপনাকেও বলবে।

হঠাৎ অস্থিরভাবে উঠে পাশের ঘরে চলে গেল রুমকি। ততক্ষণ চুপ করে বসে রইল শবর আর সুমিত।

একটু বাদে ঘরে ঢুকে রুমকি বলল, এবার আপনি যান। প্লিজ!

তাতে আপনার সুবিধে হবে না। শান্ত হয়ে বসুন।

রুমকি বসল।

পদ্মবেনকে যদি ভালবাসে তবে তাকেই কেন বিয়ে করেনি?

সেখানেও একই প্রবলেম। পদ্মবেন এক ফৌজি অফিসারের স্ত্রী। সেই ফৌজি অফিসার কাশ্মীর যুদ্ধে বীরত্বের জন্য বিশিষ্ট সেবাপদক পায় এবং একটি পা ও বাঁ হাতের আঙুল হারায়। পদ্মবেন তাকে ছেড়ে আসতে পারেনি। সেন্টিমেন্টাল এবং পারিবারিক কারণে। পদ্মবেনের একটি ছেলেও আছে। সুতরাং বাধা অনেক। বিয়ে না করলেও তারা পরস্পরকে ভালবাসে, কাছে পায়। স্বামী-স্ত্রীর মতোই মাঝে মাঝে থাকে তারা। আপনি নিজের গুপ্ত প্রণয় নিয়ে বিব্রত থাকার ফলে মলয়ের দিকে ভাল করে নজর দেননি। স্বামীর প্রতি মনোযোগী যে কোনও স্ত্রীই এটা টের পেত।

মলয় আমাকে ঠকিয়েছে?

এবং আপনি মলয়কে।

আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?

আর একটু বাকি।

আমার আর ভাল লাগছে না।

এটা ভাল লাগার ব্যাপার নয়। একটু শক্ত হতে হবে যে। আপনার সন্তান নেই, ঠিক তো!

হয়নি।

কেন হয়নি?

ওটা আবার কী প্রশ্ন? হয়নি হয়নি।

তা নয়। অনেক সময় শারীরিক দোষ থাকলে হয় না, আবার অনেক সময় সন্তান না চাইলেও হয় না। আপনার কোনটা?

জানি না।

ধরে নিচ্ছি দ্বিতীয়টা। কিন্তু আমি মনে করি সিদ্ধান্তটা খুবই ভাল। কারণ এরকম দোটানার সম্পর্কের ভিতর দিয়ে সন্তান হলে সেই সন্তানও হত দ্বিধাদীর্ণ, হতভাগ্য মানসিক রোগী। এ কাজটা আপনি ভাল করেছেন।

আর কিছু বলবেন?

হ্যাঁ। পদ্মবেন অত্যন্ত সুন্দরী এক মহিলা। প্যারাগন অফ বিউটি। মলয় তাকে আকণ্ঠ ভালবাসে। কিন্তু আপনার সঙ্গে মলয় একটা মধুর সম্পর্ক বরাবর রেখে গেছে। ইভন সেক্স। তবে সেটা নিতান্তই দেহের ব্যাপার।

কিন্তু আপনার দিক থেকে মলয়ের প্রতি আকর্ষণ ভালই ছিল। ইউ লাভ হিম।

হঠাৎ একটু উদাস হয়ে গেল রুমকি। বলল, তাতে আর কী লাভ বলুন।

লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। কিন্তু এটুকু অনুমান করতে পারি যে, আপনি নিষ্কণ্টক জীবন কাটানোর জন্য সীতানাথের হাত থেকে রেহাই চেয়েছিলেন। কারণ সীতানাথ একসময় আপনার প্রেমিক ছিলেন বটে, কিন্তু পরে তিনি হয়ে ওঠেন এক'বৃদ্ধ কামুক মাত্র। জীবনে এরকম পরিণতি আমাদের চোখের ঠুলি খুলে দেয়। যে কন্দর্পকান্তি সীতানাথের জন্য আপনি একসময় পাগল হয়েছিলেন পরে তাকেই আপনার ঘেন্না হতে শুরু করে।

রুমকি চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিল। বলল, এবার চুপ করুন। আর নয়।

কিন্তু আমার কথা যে এখনও শেষ হয়নি।

আর কী কথা? আমার যে কিছু বলার নেই।

আপনি এত কাঁদছেন কেন?

কেন কাঁদছি তা বুঝতে পারছেন না? আপনি এসে আজ আমার জীবনটাই লন্ডভন্ড করে দিলেন। আমার যে সব শেষ হয়ে গেল।

কী শেষ হল?

বুঝতে পারছেন না?

হয়তো পারছি। কিন্তু আপনিই বলুন।

পদ্মবেনের কথা কেন বললেন আমাকে? কেন এভাবে আমাকে শেষ করলেন? কত কিছু না জেনেও তো আমাদের জীবন কেটে যায়।

আমি যতদূর জানি আপনার বয়স এখন পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। এখনও আপনার সামনে লম্বা আয়ু পড়ে আছে। জীবনটা কি খুব ঝটপট কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব?

নিশ্চয়ই সম্ভব। আপনি এসেই তো সব খুঁচিয়ে তুললেন।

আপনাকে ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলি। সীতানাথবাবু মারা যাওয়ার পর আপনি এখন নিষ্কণ্টক হয়েছেন। এখন আপনি অবশ্যই আপনার স্বামীর প্রতি অধিকতর মনোযোগী হবেন। আর মনোযোগী হলেই আপনি বুঝতে শুরু করবেন, মলয় সেনগুপ্ত গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতা নয়। ঝাঁপি থেকে সাপটা একদিন বেরিয়ে পড়তই। আমি কাজটা একটু আগাম করে দিয়েছি মাত্র।

কেন করলেন? সারা জীবনের জন্য আমার সুখশান্তি নষ্ট করার জন্য

তো!

না, তাতে আমার লাভ নেই।

পদ্মবেন কোথায় থাকে?

সল্ট লেক-এ।

আমাকে ঠিকানাটা দিতে পারেন?

আপাতত নয়। আপনি এখন উত্তেজিত। এ অবস্থায় পদ্মবেনের সঙ্গে আপনার দেখা না হওয়াই ভাল।

অন্তত টেলিফোন নম্বরটা?

মলয়বাবুর কাছ থেকে জেনে নেবেন। আমি নিমিত্তের ভাগী হতে চাই না।

আপনি এবার যাবেন কি?

হ্যাঁ। যাওয়ার সময় হয়ে এল। আপনি কী সেন্ট মাখেন বলুন তো?

রুমকি অবাক হয়ে বলে, হঠাৎ এ কথা কেন?

এমনিই। জাস্ট কৌতূহল।

আপনার তদন্তে লাগবে বোধহয়।

লাগতেও পারে।

আমি অনেক রকমের মাখি। ঠিক নেই।

তবু বিশেষ পছন্দের কোনটা?

পয়জন নামে একটা সেন্ট।

এখন যেটা গায়ে মেখে আছেন সেইটে কি?

হ্যাঁ।

এটাই আপনার ফেবারিট?

হ্যাঁ।

গুড। ভেরি গুড।

এবার আমাকে রেহাই দিন, প্লিজ!

লাট্টুরামকে আপনি কতদিন চেনেন?

হঠাৎ যেন মুখের রক্ত সরে যাচ্ছিল রুমকির। মুখটা সাদা দেখাচ্ছিল। একটু ঝামরে উঠে বলল, ও মা! সে আবার কে?

লাট্টুরাম একজন প্লাম্বার। গোবিন্দপুর বস্তিতে থাকে।

তাকে আমি চিনতে যাব কোন দুঃখে?

চিনতে না চাইলে অবশ্য কিছু করার নেই।

আমি তাকে চিনি না।

সত্যি কথা বলছেন?

কেন বলব না? একজন কলের মিস্ত্রিকে চিনতে যাব কেন?

লাট্টুরাম শুধু কলের মিস্ত্রি হলে কথা ছিল না। কিন্তু তার আর একটা খুব অসাধারণ গুণ আছে। সে অনাটকীয় পদ্ধতিতে খুব চুপচাপ মানুষ খুন করতে পারে।

মাগো! না না ওসব লোককে আমি চিনি না।

খুন করার জন্য সে বেশি মজুরিও নেয় না। কারণ সে খুন করতে ভালবাসে। ওটা তার একটা প্যাশন। সে একজন বিচিত্র সাইকোপ্যাথ।

কিন্তু এসব কথা আমাকে বলছেন কেন?

লাট্টুরাম ঘোষিত গুন্ডা বা খুনি নয়। আপাতদৃষ্টিতে তাকে শান্ত, চুপচাপ এবং নিরীহ লোক বলেই মনে হয়। এমনকী তার বউ, বাচ্চা, বন্ধুবান্ধব বা প্রতিবেশীরাও তার ওই গুণের কথা জানে না।

আমারই বা জানার কী দরকার?

সীতানাথবাবু তাকে খুবই বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছিলেন। লাট্টুরামের সুবাদেই তাঁর হাতে একটা ফলাও ব্যবসা বিনা পয়সায় এসে গিয়েছিল।

আমি ওসব শুনতে চাই না।

সীতানাথবাবুর মাধ্যমেই লাট্টুরামের সঙ্গে আপনার চেনা হয়। কারণ সীতানাথবাবু একবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মলয়কে খুন করে আপনাকে পুরোপুরিই দখল করবেন।

না না, এসব মিথ্যে কথা! একদম মিথ্যে!

এসবই আমার লজিক্যাল অনুমান। তবে মলয় বরাতজোরে বেঁচে যায়, কারণ আপনি প্ল্যানটা শুনে সীতানাথবাবুর হাতে পায়ে ধরে মলয়কে বাঁচিয়ে দেন।

রুমকি ফের কাঁদতে থাকে।

সীতানাথবাবু বিস্তর পাপ করেছেন। লোকটার সম্পর্কে যত জানা যাচ্ছে ততই তাঁর সম্পর্কে আমাদের ধারণা নিম্নগামী হচ্ছে।

কান্নাভেজা গলায় রুমকি বলে, এবার কি আমাকে একটু হাঁফ ছাড়তে দেবেন?

হাঁফ ছাড়ার অনেক সময় পাবেন। আমি চলে যাওয়ার পর।

আপনি যাচ্ছেন না কেন?

কথা শেষ হয়নি বলে।

আর কী কথা?

আপনাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হত। সীতানাথবাবু বেঁচে থাকলে

আপনার জীবন পাথরচাপা ঘাসের মতো হয়ে যাচ্ছিল। আপনি আর ব্যাপারটা কন্টিনিউ করতে পারছিলেন না। একজন বুড়ো মানুষের ভোগ্যদ্রব্য হয়ে থাকা আপনার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। তাই আপনি লাট্টুরামের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসেন।

মিথ্যে! মিথ্যে! আপনি একটা রাক্ষস!

থ্যাঙ্ক ইউ ফর দি কমপ্লিমেন্ট। লাট্টুরাম আপনার প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে যায়। বোধহয় পাঁচশো বা পাঁচ হাজারের মতো খুব সামান্য মজুরিতে।

প্লিজ! আপনি চলে যান।

মার্ডার প্ল্যানটা লাট্টুরামই করে। ঘটনাটা এবার আপনার মুখ থেকে শুনতে পেলে খুশি হব। বলবেন?

ও মাগো! আপনি আর কত যন্ত্রণা দেবেন আমাকে? আমার কিছু বলার নেই।

তা হলে কি আমার মুখ থেকে শুনবেন? আমার বলার কিছু ফাঁক থেকে যাবে। আপনি বললে আমরা ক্লিন স্টোরিটা পেয়ে যেতাম।

ফের অনেকক্ষণ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বসে রইল রুমকি।

তারপর চোখের জলে ভেসে-যাওয়া মুখটা যখন তুলল তখন তার একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। খুব উদাস দেখাল তাকে। বলল, আপনি কি আমাকে ফাঁসি দেবেন?

না ম্যাডাম, পুলিশ কাউকে ফাঁসি দেয় না। দেয় আদালত আর দেন কর্তৃপক্ষ।

পুলিশই ফাঁসির পিছনে থাকে। কিন্তু ভেবে দেখলাম আমার মরতে এখন আর কোনও ভয় নেই।

ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আমি তো বলেইছি, এটা আমার আনঅফিসিয়াল ভিজিট। আমি আপনার জবানবন্দিও নিচ্ছি না। শুধু সত্যি কথাটা শুনতে চাইছি। বলবেন?

বলব। আগে একটু জল খেয়ে নিই?

হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

রুমকি উঠে ভিতরের ঘরে গেল এবং একটু বাদে হাতে একটা জলের গেলাস নিয়ে ফিরে এল।

এবার বলুন।

আমি মলয়কে ভালবাসি। ভীষণই ভালবাসি। পদ্মবেনের কথা আমি জানতাম না। কিন্তু সীতানাথবাবুর পাল্লায় পড়ে আমি যে মলয়ের প্রতি

বিশ্বস্ত থাকিনি তার জন্য আমার খুব জ্বালা হত। আপনি বলছেন, মলয় আমার আর সীতানাথবাবুর কথা জানত। ও যে জানে সেটা কিন্তু আমি জানতাম না। আমার ধারণা ছিল, মলয় আমাদের সন্দেহ করে না। কেনই বা করবে বলুন। বাপের বয়সি একটা লোক, সন্দেহ করার মতো কিছু তো ছিল না।

বুঝতে পারছি। আপনি সীতানাথবাবুর প্রতি কবে থেকে বিরূপ হয়েছিলেন?

সাল তারিখ তো জানি না। তবে ওঁর তখন বয়স হয়েছে। খুব প্যাশনেট ছিলেন। আমার প্রতি ওঁর অবসেশনটা ছিল সাঙ্ঘাতিক। সেটা একসময় আমি উপভোগ করতাম। পরে বিরক্ত হতে শুরু করি। কিন্তু উনি আমাকে ছাড়লেন না। দুটো ভয় আমাকে উনি দেখিয়ে রেখেছিলেন। একটা হচ্ছে মলয়কে জানিয়ে দেওয়া। দু নম্বর হল, মলয়কে খুন করা। আমাকে তাই ওঁর ইচ্ছের দাসী হয়ে থাকতে হয়েছে। যখন ব্যাপারটা অসহ্য হয়ে উঠল, আমার মাথা পাগল পাগল তখন আমি লাট্টুরামের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাকে বলতেই সে রাজি হয়ে যায়। এবং মাত্র পাঁচশো টাকাতেই।

তারপর?

সীতানাথবাবুর সিঁথিতে একটা ফ্ল্যাট আছে। সেখানেই উনি আমাকে ব্যবহার করতেন। ঘটনার দিনও আমরা সেখানে যাই।

কীসে যান?

ট্যাক্সিতে। ওখানে উনি নিজের গাড়িতে যেতেন না। পাছে ড্রাইভার জানতে পারে।

বুঝেছি, বলুন।

লাট্টুরামের সঙ্গে কথা ছিল সে ওখান থেকে একটা ট্যাক্সিতে রাত আটটা নাগাদ আমাদের পিক-আপ করবে।

খুনটা তো সে ফ্ল্যাটের মধ্যেই করতে পারত।

তা হলে আমার ফেঁসে যাওয়ার ভয় ছিল। সেখানে হয়তো আমার হাতের ছাপ বা চুলের কাঁটা বা আর কিছু পাওয়া যেতে পারত।

হুঁ, বুঝেছি, বলুন।

আমরা যখন নেমে আসি তখন প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে।

হ্যাঁ, সেদিন কলকাতা ভেসে গিয়েছিল। তারপর?

নীচে লাট্টুরাম অপেক্ষা করছিল ট্যাক্সি নিয়ে।

লাট্টুরামকে দেখে সীতানাথবাবু অবাক হলেন না? লাট্টুরামের তো সেখানে যাওয়ার কথা নয়।

ওই ফ্ল্যাটবাড়িটার পিছনেই সীতানাথবাবুর প্লাস্টিকের কারখানা। লাট্টুরাম সেখানে প্রায়ই যেত। ফ্ল্যাটের কথাও সে জানত। তাই তাকে দেখে উনি খুব অবাক হননি। লাট্টুরাম ওঁকে বলল বাবুজি এই বৃষ্টিতে আটকে যেতে পারেন ভেবেই সে ট্যাক্সিটা ধরে রেখেছে। না, সীতানাথবাবু সন্দেহ করেননি।

কখন তাঁকে লাট্টুরাম মেরেছিল জানেন?

জানি। বিটি রোডে প্রবল জ্যাম-এ গাড়ি আটকে গিয়েছিল। তখনই।

ফাঁস দিয়ে?

হ্যাঁ। সীতানাথবাবু টায়ার্ড ছিলেন। একটু বোধহয় ঝিমুনি এসেছিল। সেইসময়।

ড্রাইভার কিছু টের পায়নি?

বোধহয় না। টের পেলে তাকাত।

সীতানাথবাবুর সঙ্গে সেদিন একটা ব্যাগ ছিল।

হ্যাঁ। তিন লাখ টাকা ছিল তাতে।

সেটা কী হল?

আমার কাছে আছে। উনি আমার প্রতি অন্যায় করেছেন। তার দাম হিসেবে টাকাটা আমি নিয়েছি।

দাম উনি অন্যভাবেও দিয়েছেন।

দিয়েছেন, তবু ঋণটা শোধ হয়নি।

সেটা আপনার হিসেবে, তাই না?

হ্যাঁ। আমার অনেক জ্বালাপোঁড়ার হিসেব আছে।

বুঝেছি। তারপর বলুন।

কিছু বলার নেই। আমি পার্ক সার্কাসে আমার বাড়ির কাছে নেমে যাই। তারপর আর কিছু জানি না।

লাট্টুরাম আপনার কাছে সীতানাথবাবুর টাকার ভাগ চায়নি?

না।

কেন চাইল না?

হয়তো আপনি ঠিকই বলেছেন। খুন করতে ও ভালবাসে।

ড্রাইভারটি কি লাট্টুরামের চেনা ছিল?

ও তো সেরকমই বলেছিল। একজন চেনা ট্যাক্সিওলাকে নিয়ে সিঁথিতে যাবে।

এই ভদ্রলোককে ভাল করে দেখুন তো! ইনিই কিনা।

আমি তো ভেবেছিলাম ইনি পুলিশের লোক।

না। ইনি ট্যাক্সি চালান।

বলতে পারব না। ড্রাইভারের মুখ দেখিনি। সেদিন আমার মানসিক অবস্থা ছিল ভয়ংকর।

আর কিছু বলবেন?

না। এখন আমি কাঁদব। অনেকক্ষণ কাঁদব।

কাঁদুন। কান্না খুব ভাল জিনিস।

আপনি আমাকে কখন অ্যারেস্ট করবেন?

এখনই নয়।

কখন?

দেখা যাক। কান্নাটান্নাগুলো আগে সারুন। অনেক সময় পাবেন।

কতদিন সময় পাব?

তার কিছু ঠিক নেই। আচ্ছা আজ চলি। অনেক জ্বালিয়ে গেলাম।

আপনি খুব অদ্ভুত লোক!

॥ সাত ॥

আপনি কি একজন সেলফ স্যাক্রিফাইসিং ম্যান?

না।

তা হলে এই রিস্কটা আপনি নিলেন কেন? লাট্টুরাম যে খুনটা করেছে সেটা বলে দিলে তো আপনার হ্যারাসমেন্টও বেঁচে যেত।

আমি তো বলেইছি, খুন যে হয়েছে তা আমি টের পাইনি। লাট্টুরাম আমাকে তো তা বলেনি। শুধু কয়েক ঘণ্টার জন্য গাড়িটা ভাড়া নিয়েছিল।

কিন্তু লোকটা যে লাট্টুরাম সেটা জেনেও আপনি মিথ্যে কথা বলেছেন। কার স্বার্থে?

সুমিত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, লাট্টুরাম যে খুন করতে ভালবাসে সেটা আমার জানা ছিল না। যখন গোবিন্দপুর বস্তিতে থাকতাম তখন আমার দুর্দিনে লাট্টুর বউ আমার জন্য অনেক করেছে। শেষ অবধি হয়তো বলেই দিতাম, কিন্তু ব্যাপারটা বুঝে উঠতে আমার সময় লাগছিল। মনে হচ্ছিল আমার মুখের একটা কথায় একটা লোকের ফাঁসি বা যাবজ্জীবন হয়ে যাবে, কাজেই ভেবে দেখা দরকার।

না। আমার মনে হয়, আপনি একজন স্বনিযুক্ত লিডার গোছের মানুষ। নিজের লোকজনকে প্রোটেক্ট করতে ভালবাসেন। লাট্টুরামও আপনার একজন অনুগত লোক। তাই না?

সুমিত চুপ।

ইট ওয়াজ এ ব্লান্ডার। লাট্টুরামকে প্রোটেক্ট করাটা আপনার ভীষণ ভুল কাজ হয়েছে। আমি যদি তদন্তে না নামতাম তা হলে আপনি ডকে চড়তেন। বুঝেছেন?

হ্যাঁ।

ভবিষ্যতে হিরো হওয়ার চেষ্টা একদম করবেন না। ইট ইজ এ ন্যাস্টি ওয়ার্ল্ড।

লাট্টুরামকে কি অ্যারেস্ট করা হয়েছে?

হ্যাঁ।

আপনি বলেছিলেন, লাট্টুরাম একজন হত্যাশিল্পী। তা হলে সে সীতানাথবাবুকে গলায় ফাঁস দিয়ে মারল কেন? এটা তো মোটা দাগের কাজ।

হ্যাঁ, খুবই মোটা দাগের কাজ। লাট্টুরামের কাজ বলে মনেই হয় না।

তা হলে?

বললে বিশ্বাস করবেন?

হ্যাঁ।

লাট্টুরাম এখন নিজেকে ভয় পায়। নিজের প্রতিভায় সে নিজেই বিস্মিত। ভীত। তাই সে মাঝে মাঝে পাগলামিতে ভোগে। সে ইচ্ছে করলে ডেডবডিটা রাস্তায় ফেলে রেখে চলে যেতে পারত। তাতে আপনি বা লাট্টুরাম কাউকেই সহজে ধরা যেত না। কিন্তু সে তা করেনি। কারণ সে ধরা পড়তে চেয়েছিল।

সে কী?

আপনাকেও সে বিপদে পড়তে দিত না। সে ঠিক করেছিল, দিন কুড়ি-পঁচিশের মধ্যে কাজকারবার ছেলেকে বুঝিয়ে দিয়ে এসে সারেন্ডার করবে। একজন মনোরোগী হিসেবে তার সাজা কম হওয়ারই কথা। আমি তার কথা বিশ্বাস করি। এরকম হতেই পারে।

আর একটা কথা।

বলুন।

রুমকিকে কি আপনি অ্যারেস্ট করবেন?

কোন গ্রাউন্ডে?

কোনও গ্রাউন্ড নেই?

আরে মশাই, গ্রাউন্ড তো আছেই। ভদ্রমহিলাও ব্যাভিচারী। কিন্তু তবু ওঁকে আমি একটা চান্স দিতে চাই।

আপনি একজন অদ্ভুত মানুষ।

অনেকে তাই বলে।

সন্ধেবেলা ঠাকুরকে জল বাতাসা দিয়ে খুব ভক্তি করে প্রণাম করল দীয়া।

ঠাকুর, সবাইকে ভাল রাখো। সবাইকে... সবাইকে...

অনেকক্ষণ লাগল প্রণাম করতে। তারপর শাঁখ তুলে নিয়ে তিনবার বাজাল।

ঘরে কেউ নেই। বুড়ু বিশু কিন্তু এখনও খেলা শেষ করে ফেরেনি। ঠাকুরের সামনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে সে চেয়ে রইল একদৃষ্টে। চোখ ভরে এল জলে। তারপর ভীষণ লজ্জায় মরে গিয়ে ফিস ফিস করে বলল, ওকে ভাল রেখো ঠাকুর, ওকে ভাল রেখো। গত পনেরো দিন আসেনি। কে জানে কেমন আছে। আমাকে তো আর পছন্দ করবে না কখনও। না করুক। শুধু ভাল থাকলেই হবে। আর কিচ্ছুটি চাই না—

কী বললে ঠাকুরকে?

ভীষণ চমকে পিছু ফিরে চাইল দীয়া। চোখে এখনও জল, দৃষ্টি আবছা। তবু চিনতে কি ভুল হয়? কিন্তু এও কি সম্ভব? এরকম কি হতে পারে? দরজায় হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে, যেন ঠাকুরই এসেছেন।

ঘরে আসবেন না?

না। তুমি একা আছ। এসময় আসা ঠিক নয়।

দীয়ার মাথা বুকে নেমে এল, রুটি তরকারি খাবেন বলেছিলেন।

হ্যাঁ তো। কেমন রাঁধ তুমি?

খেয়ে বুঝবেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুলু বলল, খেতে তো হবেই। হয়তো সারা জীবন তোমার হাতেই খেতে হবে।

এমা! কী বলছে রে : ইস্! মরে যেতে ইচ্ছে করছে যে! ঠিক শুনছে তো সে?

পরেশদাকে একবার আমার কাছে যেতে বোলো। কাল রবিবার আমি বাড়িতে থাকব। জরুরি কথা আছে।

দীয়ার মাথা উঠল না। সে চোখ তুলে তাকাতেও পারছে না।

কী, মনে থাকবে বলতে?

মনে আবার থাকবে না! বাব্বা! কাল সাতসকালেই বাবাকে ঠেলে পাঠাবে সে। কিন্তু সত্যি শুনছে তো! ভুল নয়? সে শুধু ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল।

আজ আসি।

চোখ তুলল দীয়া। দরজায় কেউ নেই। সে ফের কেঁদে উপুড় হয়ে পড়ল ঠাকুরের সামনে। চারদিকে হুলুধ্বনি হচ্ছে এখন, শাঁখ বাজছে।
